নেপথ্য নায়িকা

[একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে]

সব্যসাচী

সিটি বুক এজেন্সী
প্রকাশক ও পরিবেশক
৫৫, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৫

প্রকাশক :

পি, দে

৫৫, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :

শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল

কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস প্রাঃ লিঃ

৯, পঞ্চানন ঘোষ লেন,

কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী

শচীন বিশ্বাস

॥ এক ॥

শেষ পর্যন্ত প্রমাণাভাবে অভিযোগ টিকল না। বেকসুর খালাস পেয়ে গেল সে। আঃ! দু'মাসের অবরুদ্ধ হাওয়া থেকে মুক্তি! পদ্মিনী প্রাণভরে আবার নিঃশ্বাস নিল রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে। পশ্চিমের হেলা রোদে পিঠ করে মেঘমুক্ত আকাশের দিকে তাকাতে পারল আবার।

কিন্তু তারপর? আবার সেই পথ! যে পথ জন্ম থেকে তাকে জাহান্নমের ঘাটে ঘাটে দৌড় করিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। নাকি ভাগ্য তাকে ভাগ্যক্রমে ইজ্জতের সঙ্গে বাঁচবার, যে ডাল আঁকড়ে ধরবার সুযোগ দিয়েছিল সে ডালের আবার নাগাল পাবে সে।

মুক্তি সে পেয়েছে বটে। কিন্তু তার উনত্রিশ বছরের জীবনে এমন অসহায় কখনও বোধ করেনি। প্রমাণ হোক বা না হোক— ইজ্জতের সঙ্গে বাঁচবার রাস্তা বন্ধ হবার পক্ষে খুনের অভিযোগই কি যথেষ্ট নয়! তার উপর আবার সে মেয়েমানুষ। এর পর কোনো সৎ পদস্থ মানুষের পক্ষেই কি আর সহৃদয় হওয়া সম্ভব!

নেপথ্য গায়িকা হিসাবে সে কতখানি নাম করতে পারবে ভগবান জানেন। কিন্তু তার আগেই সে বিখ্যাত হয়েছে খুনের অভিযোগে। মামলা চলাকালে তার যাবতীয় বিবৃতি ফলাও করে সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে। তার ছবিও বাদ যায়নি। তাহলে আর বাকী কি?

মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজের লোকেরা যে অমন করে ঘেরাও করে ধরবে—কে জানত। কি কাণ্ড করে যে সে তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে রাস্তার এই ফাঁকা কোণটাতে এসে দাঁড়াতে পেরেছে তা একমাত্র সেই জানে।

—১

ভগবানের অসীম করুণা, তাই ফিল্ম পরিচালক পরিমল চৌধুরীকে উদ্দেশ করে নিক্ষিপ্ত গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল। কিন্তু একজন ড্রাইভারের জীবনও তো কম নয়।

একথা ঠিক যে প্রত্যক্ষতঃ তার দায়িত্ব নেই। কিন্তু অপ্রত্যক্ষ দায়িত্ব?

অবশ্য ঘটনার পর পুরো একটা দিন এই ভাবের চিন্তাটা আদৌ তার মাথায় আসেনি। আর হয়ত আসতও না কোনোদিন! যদি না সেই উড়ো বেনামী চিঠিটা এসে হাজির হত তার হাতে।... এখনও ফিরে আসার পথ আছে। নইলে বুঝতে পারছ...ইত্যাদি ইত্যাদি।

পাদ্মনী ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি যে বোম্বে থেকে ওরা কলকাতা পর্যন্ত ধাওয়া করতে পারে। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা যেন সে হারিয়ে ফেলেছিল।

না, না, পদ্মিনীবাঈ এরপর আর জীবনের ভয় করে না। পরিমল চৌধুরী শুধু কি তার আশ্রয়দাতাই! তার যদি কেউ পিতা থেকে থাকেন—উনি যে তার চাইতেও বড় পদ্মিনীর কাছে। হয়ত ভরসা করে তার কাছেই প্রথম যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কি যে হলো তার মাথার মধ্যে। ঊর্ধ্বশ্বাসে থানায় গিয়ে হাজির হলো তৎক্ষণাৎ।

থানা চিঠিখানা রাখল। আর সঙ্গে চিঠির মালিককেও। এ সম্ভাবনার কথা সে আদৌ ভাবেনি।

একদিক থেকে ভালই হয়েছে। নইলে, এই যে সহজ ভাবে সে নিঃশ্বাস নিতে পারছে, তা পারত কি?

পদ্মিনী অবশ্যি ঘাবড়ায়নি। সে নিজে রাজস্থানী। কিন্তু সঙ্গ করেছে ছত্রিশ জাতের। পিটার ছিল দক্ষিণী খৃষ্টান। পাপস্খালনের জন্য স্বীকৃতির সঙ্গে আগেই তার পরিচয় হয়েছিল। তার নিজের কি ধর্ম তা সে জানে না। তবু মনে মনে—ঠিক করেছিল পুলিশের কাছে

স্বীকৃতিই সে দেবে। মর্যাদাচ্যুত স্খলনের, পাপের প্রায়শ্চিত্তের, এতবড় সুযোগ সে হাতছাড়া করবে না।

এবং তার দীর্ঘ জবানবন্দীতে, সে তার কোন পাপই গোপন করেনি। না পুলিশের কাছে, না বিচারকের কাছে।

দুনিয়ার সামনে তার পাপের স্বীকৃতি। খুনী সন্দেহে দু'মাসের এই হাজতবাস—এরপরও কি ভগবান তাকে ক্ষমা করেন নি। গ্লানিমুক্ত হতে পারে নি সে।

আচ্ছা পরিমল চৌধুরী সব জেনেও কি তাকে ক্ষমা করতে পারবেন? আত্মস্থ ভাবে সে নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করল।

প্রথম তার সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কোথায় থাক তুমি?

সে পরিহাসের সঙ্গে জবাব দিয়েছিলো—জাহান্নমে।

হেসেছিলেন পরিমল চৌধুরী। আর কোনোদিনই কিছু জানতে চান নি তিনি। তিনি কি ঘুণাক্ষরে ধারণা করতে পেরেছিলেন পদ্মিনীর জাহান্নমের চেহারা ঠিক এই রকম! ধারণা করতে পারলে কি সে আশ্রয় পেত তার কাছে?

পদ্মিনীবাঈই তার আবিষ্কার নাকি তিনিই পদ্মিনীর আবিষ্কার সেটা অবশ্য গবেষণার বিষয়।

যদিও দৃশ্যতঃ দেখতে গেলে—পদ্মিনাকে পরিমল চৌধুরীই আশ্রয় দিয়েছিলেন। আস্তাকুঁড় থেকে তিনিই কুড়িয়ে এনেছিলেন পদ্মিনীকে। স্থান দিয়েছিলেন নিজের পরিবারের মধ্যে।

একটা হিন্দী ছবি পরিচালনা উপলক্ষে তিনি তখন বম্বে। শীতের সন্ধ্যা। শিবাজী পার্কের কোণে বেশ মাঝারি গোছের একটা ভিড় দেখে এগিয়ে গেলেন চৌধুরী।

একটা মলিন ঘাঘরা পরা বয়স্কা মেয়ে গান গাইছে। দৃষ্টি শীর্ণ। কিন্তু চোখ দুটি অভিব্যক্তিময়। গলায় ঝোলানো একটা

সিঙ্গেল রীডের হারমোনিয়াম। তারই ভারে বেচারীর শিরদাঁড়া ঝুঁকে পড়েছে। মুখখানা মৃত মানুষের মত পাংশু।

গানের সঙ্গে নাচছে একজোড়া তরুণ-তরুণী। উভয়েই ভিখারী শ্রেণীর। আর মাঝে মাঝে হাত পেতে পয়সা তুলছে।

ছেলেটির পরণে একটি ছেঁড়া কলার-তোলা গেঞ্জি। মেয়েটিরও পরণে একটি মলিন ও ছিন্ন ঘাঘরা। যেমন তাদের পোষাক, তেমনি তাদের নাচ ও অঙ্গভঙ্গী! আমেরিকা মার্কা টুইষ্টের কিছুটা নিকৃষ্ট অনুকরণ ছাড়া নাচের কিছু মাথামুণ্ডু পেলেন না তিনি। কিন্তু গায়িকা মেয়েটির কণ্ঠে গানের কলি শুনে চৌধুরী সেদিন সত্যিই চমকে গিয়েছিলেন।

নতুন নতুন শিল্পী ও গুণী খুঁজে বার করবার দিকে চৌধুরীর চিরকাল অসাধারণ ঝোঁক। এ জন্য জীবনে তিনি বহু ত্যাগ স্বীকার করেছেন। বহু দুর্ভোগও সহ্য করতে হয়েছে তাকে। প্রকৃত জহুরীর মত তিনি যে জহর চিনবার ক্ষমতা রাখেন—এর আগে দু'একবার তা' প্রমাণিত হয়েছে!

এবং সেই শিবাজী পার্কের কোণ থেকেই কুড়িয়ে এনেছিলেন পদ্মিনীকে। বলতে গেলে আস্তাকুঁড় থেকেই আশ্রয় দিয়েছিলেন নিজের কাছে। ওস্তাদ রেখে বেশ কিছুদিন তালিম দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এবং তাঁর বম্বের সেই ছবিতে দু'খানা প্লেব্যাকও করিয়েছিলেন।

ছবির কাজ শেষ হতে বম্বে ছেড়েছিলেন। কিন্তু পদ্মিনীকে ছাড়েননি। কলকাতায় এনেছিলেন সঙ্গে করে। তারপর থেকে পদ্মিনীবাঈ তার পরিবারেই একজন।

এখানে বাঙলাগানের সঙ্গে পরিচয় ও শিক্ষার নিখুঁত বন্দোবস্ত করেছিলেন। শেষ অবধি তার বিশ্বাস অটুট ছিল—বম্বের ছবি মুক্তির পর—পদ্মিনী তার কত সার্থক আবিষ্কার তা' প্রমাণিত হবেই। বলা বাহুল্য পদ্মিনী তাকে হতাশ করেনি।

পদ্মিনীর সঙ্গে চৌধুরীর প্রথম যখন সাক্ষাৎ হয় তখন তার জীবনের আটাশটা বছরও পুরো অতিবাহিত হয়নি। কিন্তু দেখলে মনে হ'ত যেন চল্লিশের উর্ধ্বেই তার বয়স।

মানুষের কপটতা ও নৃশংসতার সঙ্গে অবিশ্রান্ত লড়াই করে তখন তার পিঠ কুঁজো, সারা দেহ ব্যাধি আর দুঃখের গ্লানিতে জর।

দৃঢ় দুটো চোয়ালের উপর চোখা নাক বসানো মুখখানা যেন রক্তহীনতায় পাংশু। শুধু ভাসা ভাসা বাঙ্ময় চোখ দুটিতে তখনও উত্তাপের কিছুটা অবশিষ্ট। আর ভগবদ্দত্ত যে বস্তুটির উপর আজও বিন্দুমাত্র ক্ষয়ক্ষতির ছাপ পড়েনি সেটি তার অপূর্ব কণ্ঠ।

আশ্চর্য মানুষের মন। পদ্মিনীর জীবনে মানুষের হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে পরিচয় ছিল এত সামান্য যে মানুষের কাছ থেকে বিশেষ কোন প্রত্যাশা তার থাকার কথা নয়। অথচ অন্তরের গভীরে সেই প্রত্যাশাই তাকে ভর করেছিল।

সে ভাবতো তখন প্রতিদিন। সেই অঘটন কি কোনদিন ঘটবে—হে ভগবান! এমন কোন হৃদয়ের সন্ধান কি সে পাবে—যাকে আশ্রয় করে সে এই প্রতিমুহূর্তের লাঞ্ছিত জীবন থেকে উদ্ধার পাবে। আরও একটু আত্মসম্মানের সঙ্গে জীবন কাটাতে পারবে।

কাজেই পদ্মিনীর দিক থেকে পরিমল চৌধুরী যে তার আবিষ্কার নয়—একথা হলফ করে কি সেই বলতে পারে।

॥ দুই ॥

পদ্মিনী যে কার মেয়ে পদ্মিনীর মা কোনদিন তার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারেনি। আর পদ্মিনীরই কি সে কৈফিয়ৎ চাইবার হিম্মৎ ছিল!

মা গান গাইতেন একটা ছোট রামযাত্রার দলে। অধিকারী দল নিয়ে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াতো। মায়ের তাই পাত্তা থাকতো না। কাজেই দিদিমার কাছেই কেটেছে তার ছোটবেলা।

ছ' সাত বছর পর্যন্ত—বছরে এক আধবার সে মায়ের সাক্ষাৎ পেতো—দিদিমার ডেরায়। ব্যাস ঐটুকুই মায়ে-ঝিয়ে পরিচয়।

দিদিমার তখন তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। তিনি তখন একটা বস্তীর বাড়ীওয়ালী। তবে বৈশিষ্ট্য এই যে তার ভাড়াটিয়ারা সবাই মেয়ে।

বলতে গেলে তার জ্ঞান চক্ষু ফোটার পর থেকে সে দেখত—প্রতি সন্ধ্যায় তাদের বস্তিতে বসত রূপচর্চার হাট। হরেক রকম মানুষের চলত আনাগোনা। হারিকেনের পাঁশুটে আলোয় সেই সব মাতাল, অর্ধনগ্ন সব নরনারীর হুল্লোড়। আর ভালবাসা নামধেয় একটি বহু আলোচিত বস্তুর বিকিকিনি।

ছোটবেলায় মায়ের ভালবাসার আস্বাদ ছিল তার কাছে প্রায় অপরিজ্ঞাত। তখন থেকেই সে বুঝতে শিখেছিল—দুনিয়ায় ভালবাসার রকম একটাই! এবং সামগ্রীটি পয়সা দিয়ে কিনতে হয়।

একটু বয়স বাড়তেই দিদিমা তাকে অল্প অল্প করে ফাই-ফরমায়েস খাটাতে সুরু করলেন! সন্ধ্যার পর ভাড়াটেদের ঘরে পৌঁছে দেবার জন্য সে রাস্তার দোকান থেকে কিনে আনত পান, সিগরেট, বিড়ি।

দিদিমার ঘরটা অবশ্যি একটু তফাতেই ছিল। এবং যতদূর সম্ভব দিদিমা ভাড়াটেদের ঘর থেকে তাকে তফাৎ করে রাখবারই চেষ্টা করতেন। কি উদ্দেশ্যে জানা নেই তার।

আরও একটা বড় উপকার করেছিলেন দিদিমা। খানিকটা লেখাপড়া আর সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছিলেন তিনি। মা এবং দিদিমা দুজনেই গানবাজনা জানতেন। এবং খানিকটা লেখাপড়াও।

এমনি করেই কাটলো তার জীবনের ষোলটা বছর। স্বভাবতই তার মানসিক গঠনের মধ্যে স্থায়ী ছাপ পড়ল এই বিকৃত পরিবেশের ; অতএব ষোল বছরের যুবতী পাদ্মিনীর চামড়ার তলায় উদ্দাম যৌবনের রক্ত তখন যদি কিছু অসঙ্গত উত্তেজনা সৃষ্টি করে থাকে—তার দায়িত্ব কি শুধু পদ্মিনীর!

হঠাৎ একদিন ঝ'ড়ো কাকের মত উদয় হলেন মা। সঙ্গে সেই মহাদেবের মত ভুড়িওয়ালা অধিকারী মশাই। বললেন দিদিমাকে,—এখন আর পদ্মিনীকে এখানে রাখা চলে না মাইজী।

বুড়ী বলল,—ভয় নেই বেটী। ও আমার নাতনী তো।

পদ্মিনীর উপর বুড়ীর মায়া পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু মা'ও নাছোড়।

বলল,—নাতনী দেখিয়ে কি হবে মাইজী। অধিকারীর সঙ্গে আমার সাদি হোক বা না হোক, আমরা যখন একসঙ্গেই আছি লড়কী আমাদের সঙ্গেই থাকবে। যতই হোক আমাদের ডেরা তোমার এখানকার মত বারোয়ারী হাট তো নয়।

বুড়ী হঠাৎ স্মৃতি ধারণ করে মুখ ছোটাতে স্বরু করল।

—সড়কীর লড়কী। তার সঙ্গে আবার সম্পর্ক কি। এত অবিশ্বাস যদি তবে রেখেছিলি কেন লেড়কী আমার কাছে। তবু যদি বাপের সংসারে লড়কী নিয়ে যেতে পারতিস বুঝতাম।—

পদ্মিনীর মা'ও ছাড়ার পাত্রী নয়—।

—আ হা হা—মাইজী হয়ে তুমিই বা কোন বাপের সংসারে রেখেছিলে নিজের লড়কীকে?

শেষ পর্যন্ত অবশ্যি মায়েরই জিৎ হল।

দিদিমা সুর করে খানিক কাঁদলেন।

কিন্তু শেষ অবধি মায়ের সঙ্গে পদ্মিনীকে চালান হতেই হল অধিকারীর সংসারে। অধিকারী সত্যিই তার বাপ ছিল কিনা জানে না পদ্মিনী। কিন্তু মায়ের সংসারে এসে যেটা তার সব চাইতে খারাপ লাগত, সেটা হল—অধিকারীকে বাবুজী বলে ডাকা।

ছোট্ট একটা কথা বাবুজী। অথচ ঐ কথাটুকুই জিভের আগায় আনতে গিয়ে প্রথম প্রথম সমস্ত চোখ মুখ তার লাল হয়ে উঠত। শরীর মন সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করত।

মা অধিকারীর মন রাখার চেষ্টা করতো। তাই মায়ের সঙ্গে এই নিয়ে বাধতো খিটিমিটি। শেষে ঠেঙ্গানি খাবার ভয়ে অনেক কষ্টে রপ্ত করতে হয়েছিল ডাকটা।

ইতিমধ্যে পুরানো দল ভেঙ্গে গেছে। অধিকারী আর মা দুজনে মিলে চেষ্টা করছিল তখন নতুন রামযাত্রার দল গড়ার। এই নিয়ে তাদের মধ্যে প্রায়ই লাগতো খিটিমিটি। তার উপর যেদিন দু'জনে নেশা করতো সেদিন খিটিমিটি পরিণত হতো ঝগড়ায়। একদিন ঝগড়া মারামারিতে পরিণত হল। অধিকারী মশাই রাগ করে সেই যে তার মাকে ত্যাগ করে চলে গেল আর ফিরল না।

মায়ের মুখেই শুনেছে—অধিকারীর নাকি দেশে বউ ছেলে-মেয়ে ছিল।

প্রথম কিছুদিন চুপচাপ কাটল। পরে মা প্রায়ই খুব কান্নাকাটি করতো। নেশার ভাগটাও বাড়িয়ে দিল। ভারী হতাশ দেখাতো মাকে তখন। পদ্মিনী তখন সবই বুঝতে পারতো বলে খুব খারাপ লাগতো তার।

হঠাৎ একদিন সে অবাক চোখে তাকিয়ে দেখল—আর একজন লোক জুটিয়ে এনেছে মা। ভেবে সে মুষড়ে পড়ল যে আর একটা নতুন লোককে তার বাবুজী বলে ডাকতে হবে। মাকে সে বলেই ফেললে শেষটায়—যাকেই তুমি ধরে আনবে, তাকেই বাবুজী বলে ডাকতে হবে নাকি!

মা তার গালে তীব্র এক চড় বসিয়ে দিয়ে বল্লেন—আলবৎ হবে। পদ্মিনী এমনিতেই কথা বলত কম। সেদিন থেকে একেবারে পাথর হয়ে গেল সে।

এই নতুন লোকটা ছিল ড্রাইভার। দিলটা তার লম্বাই ছিল অধিকারীর তুলনায়। এবার সে আর মা নতুন বাবুজীর সংসারে। এবং এই ড্রাইভার লোকটিকে যখনই বাবুজী বলে ডাকতে হত—আবার একটা বিদ্রোহ তার তরুণী মনে আড়মোড়া ভাঙ্গত।

তাদের বস্তির পাশেই ছিল একটি মোটর মেরামতের কারখানা। সেখানে কাজ করত এক তরুণ ক্লীনার। নাম রামালু। দক্ষিণ ভারতীয়। কিন্তু দক্ষিণী কায়দার উচ্চারণে হিন্দীটা বলতে পারত অনর্গল। তার এই নতুন বাবুজী ছেলেটিকে খুব খাতির করত।

সেই সূত্রেই রামালুর সঙ্গে তার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। রামালুর কালিঝুলি মাখা পোষাকের আড়ালে দু'খানি মোষের মত কালো বলিষ্ঠ বাহু তাকে আকর্ষণ করতে সুরু করল।

ইতিমধ্যে আর একটা জিনিস সে রপ্ত করে ফেলেছিল। সেটা হল গান গেয়ে ভিক্ষা করা। মা তখন প্রায় রোজই নেশা করত। ফলে পয়সার টান হয়ে উঠল নিত্য নৈমিত্তিক। সেও ভিক্ষালব্ধ পয়সার একটা অংশ মায়ের হাতে এনে দিত। মা প্রকারান্তরে এ জিনিসটাকে প্রশ্রয়ই দিতেন।

দিদিমার দেওয়া সেই সাঙ্গেল রীড হারমোনিয়ামটা গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ত। ভগবদ্দত্ত তার স্বর্ণকণ্ঠ আর উঠতি বয়স। এই দু'য়ে মিলে—যেদিন বেরুত—রোজগার ভালই হত।

তার স্বর্ণ কণ্ঠে নাকি উঠতি বয়েসে—কোনটা দ্বারা রামালু তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তার জানা নেই। হঠাৎ একদিন সে বেড়াতে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করে বসল পদ্মিনীকে।

সত্যিকার বলতে কি—মনে মনে খুসীই হল সে। রাজী হল প্রস্তাবে। শহরতলীর এক নির্জন পরিবেশে রামালু হঠাৎ তার ডানহাতটা বগলদাবা করে আবেগের সঙ্গে বলল,—তোমার এমন মিষ্টি গলা। তোমার এমন রূপ। তোমার এমন বয়েস। তুমি ভিক্ষে কর কেন পদ্মিনা। তার চাইতে চল তুমি আমার কাছে থাকবে।

পদ্মিনীর মনে হল সে যেন কারও গান শুনছে। চোখের দিকে তাকিয়ে দেখল রামালুর চোখ দুটো কি অপরূপ স্বপ্নময় দেখাচ্ছে।

রামালুর আগে এরকম প্রস্তাব কেউ তাকে করেনি। আর, কোন পুরুষের এই রকম প্রস্তাব যে স্ত্রীলোকের পক্ষে নাকচ করা সম্ভব—এ ছিল তার ধারণার অতীত—ছোটবেলা দিদিমার কাছে সেই বিকৃত পরিবেশের মধ্যে দিন কাটানোর জন্যই হোক অথবা অন্য কারণেই হোক। স্ত্রীলোকের অধিকার সম্পর্কে এমনি একটা অক্ষম বোধ তার চিন্তার মধ্যে অদ্ভুত বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল।

অথবা সত্যিই হয়ত রামালুর প্রতি তার আকর্ষণ দুর্বার হয়ে থাকবে। নইলে সেই যে দেহের প্রতিটি অঙ্গে অনাস্বাদিত সেই শিহরণ! তার কি মানে! সঙ্গে সঙ্গে সলজ্জ মাথা নাড়ল সে। আর রামালুও ঝাঁপিয়ে পড়ে আলিঙ্গনে পিষে ফেলল তাকে।

সামাজিক বিয়ের কথা তার মাথায় ছিল না তেমন কোনদিন। সে পালিয়ে গেল রামালুর সঙ্গে। ঘর বাঁধল। পুরানো কাজ ছেড়ে দিয়ে একটা নতুন গ্যারেজে কাজ জোগাড় করে নিল রামালু। ব্যাস্ চুকে-বুকে গেল মার সঙ্গে।

সবার কাছে আজ হাস্যকর মনে হবে কিনা কে জানে। কিন্তু তার দৃঢ় ধারণা—সত্যিকারের ঘর যদি কারও সঙ্গে জীবনে কোথাও বেঁধে থাকে—সেটা সেই রামালুর সঙ্গে।

রামালু যে তাকে কী অদ্ভুত ভালবাসতো—তা বুঝেছিল সে অনেক—অনেকদিন পরে। রামালুকে নিয়ে গান বাঁধা ছাড়া, সেই তখন তো আর কোন উপায় রাখেন নি ভগবান! অথচ পদ্মিনীর কাছে ভালবাসার ধারণা তো তখন অন্যরকম।

সামান্য রোজগার রামালুর। দু'বেলা দু'জনার স্বচ্ছন্দে চলা ভার। তারই মধ্যে রামালু তাকে মধ্যে মধ্যে ডুরে শাড়ী এনে দিত। রূপার মল এনে দিয়েছিল যে রাত্রে—সে রাত্রের কথা কোন দিন ভুলতে পারবে না সে।

ইতিমধ্যে পেটে এসে গেল বাচ্চা। মাত্র সতের বছর তার বয়স তখন। এ সময় ইচ্ছে হয় একটু ভাল মন্দ খাবার। মনে আসে মায়ের কথা। আর ঠিক ঐ সময়েই কিছুদিনের জন্য রামালুর কাজে যাওয়া বন্ধ হল। কি ব্যাপার—নাকি হরতালি।

ফুরসৎ দেখে মায়ের খোঁজ করতে বলল রামালুকে। রামালু প্রথম রাজী হয়নি। তার কিন্তু বিশ্বাস হয়েছিল কেমন—যতই হোক এ সময় মা রাগ করে থাকতে পারবে না।

শেষে রামালু গেল। কিন্তু যে খবর আনল, সেটা অমনিতে তার কাছে অসাধারণ কিছুই নয়। অথচ সেদিন সে মায়ের জন্য অনেকক্ষণ কেঁদেছিল।

সেই ড্রাইভারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল রামালুর। তার মা ড্রাইভারকে ত্যাগ করে অন্য এক ভদ্রলোক বাবুর সঙ্গে কোথায় উধাও হয়ে গেছে সে বলতে পারেনি।

ইতিমধ্যে একটি মেয়ে হল তাদের। রামালু তো ভীষণ খুসী। গায়ের রং যে মেয়ের তারই মত নিকষ কালো। আর চোখ দু'টি পদ্মিনীর মতই ডাগর ডাগর। সে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে আদর করত আর বলত, তার দক্ষিণী ঢঙের হিন্দীতে,—লড়কীর ভিতরে আমি ভি আছি, তুমি ভি আছো পদ্মিনী।

মেয়ে হল বটে। কিন্তু যে মানুষ রোজগার করে দু'টো পেট ভরাতে পারে না ভাল করে, তিনটা পেট চালান তার পক্ষে আরও দুরূহ হয়ে উঠল। ফলে রামালুর উপর ক্রমশঃ বিরক্তি জমে উঠতে লাগল পদ্মিনীর।

এদিকে অভাব যত বাড়তে লাগলো রামালুর ভালবাসাও যেন তত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে সুরু করল। সময় নেই অসময় নেই তার শরীর নিয়ে এমন আদিখ্যেতা করত, যে তার সহ্য করতে কষ্ট হতো।

একটা বাচ্চা হবার ধকল। তার উপর আধপেটা খেয়ে খেয়ে শরীরটা অসম্ভব কাহিল হয়ে পড়েছিল এ সময়।

দাঁতে দাঁতে চেপে কোন রকমে বিরক্তি প্রকাশ সম্বরণ করত পদ্মিনী। ভাল খাবার নেই। দু'খানার যায়গায় তিনখানা কাপড় নেই পরবার। বুকের দুধ ছাড়া মেয়েটা দুধ পায় না। অথচ রাত্রে বিছানায় এসে রামালুর পাগলামী যেন সীমা ছাড়িয়ে চলে।

বাচ্চাকে নিয়ে সে যে কি করবে দিশা পায় না যেন। আদর করতে করতে বলে পাদ্মনীকে উদ্দেশ করে,—আমি দক্ষিণের মানুষ, তুমি উত্তর দেশের। আমি তামিলা, তুমি রাজস্থানী। আমাদের মেয়েটা তাহলে কোন্ দেশের পদ্ম।

এই আদিখ্যেতায় শরীর জ্বলত রি রি করে। মনে হত এ শুধু ওর অক্ষমতার নিশানা। রামালুর ভালবাসা ক্রমশঃ মূল্যহীন ও বিস্বাদ লাগতে লাগল। মনে হতে লাগল, ভালবাসার নামে সস্তায় কিস্তি মাৎ করার, কি বিরক্তিকর চেষ্টাই না সুরু করেছে রামালু। অক্ষম পুরুষ মানুষের যা স্বভাব।

অল্পভাষী সে। বলত না কিছুই। রামালুর বিরুদ্ধে তার সত্তার এই বিদ্রোহকে সে ধৈর্য দিয়ে বিবেচনা দিয়ে চেপেও রেখেছিল অনেকদিন।

কিন্তু সেও তো মায়ের মেয়ে। তার রক্তেও তো দিদিমার উত্তরাধিকার। ভালবাসা বেকি-কিনির হাটের সওদাই যখন, তখন এই ভাবেই চিরকাল তাকে বাঁচতে হবে নাকি! কে জানে হয়ত সেই থেকেই মনে মনে প্রস্তুতির সূচনা।

রামালু কাজে গেলে সেই অবসরে তার পুরানো পেশাকে সে কাজে লাগাতে সুরু করল আবার—গলাকে কাজে লাগিয়ে। কিন্তু তার চাইতেও বড় লক্ষ্য তখন থেকেই মনের মধ্যে অলক্ষ্যে জন্মলাভ করেছিল কিনা কে জানে। ভাগ্যিস দিদিমার দেওয়া হারমোনিয়ামটা আনতে ভোলেনি।

রামালু কি করে জানতে পারল একদিন। গোঁমড়া মুখ করে কৈফিয়ৎ চাওয়ার সুরে বলল,—পদ্ম তুমি নাকি ভিক্ষেয় বেরুচ্ছ।

প্রথমটা কোন জবাব দিল না পাদ্মিনী।

গলার স্বর চড়ল রামালুর—জানবে তুমি একজনের জেনানা আছ। আর একটা লড়কীর মা।

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল এবার সে। বল্ল,—যেন তখনই ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়।

—ইস্ জেনানা পুষবার সখ আছে। লড়কীর বাপ হবার সখ আছে। খাওয়াবার মুরোদ নেই অথচ ইজ্জৎ আছে জোর।

আবলুষের মত বর্ণের মধ্যে সাদা দাঁতগুলো ছুরির ফলার মত ঝক্‌ঝক্ করে উঠল রামালুর। বুক আর হাতের পেশী কেমন যেন ফুলতে লাগল।

—কি মারবে নাকি ?—জিজ্ঞাসা করল রামালু।

—না মারবে না—আদর করবে—রাগে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল পদ্মিনী।

বেচারা কি ভেবেছিল কে জানে। আর জবাব দিল না। ফুঁসতে ফুঁসতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

॥ তিন ॥

ইতিমধ্যে রাস্তার বিশেষ বিশেষ মোড়ে পদ্মিনীর গানের কিছু ভক্ত তৈরী হয়েছিল।

একটা বড় হোটেলের পাশে গান জমিয়েছিল একদিন। দেখতে দেখতে প্রচুর, শ্রোতা জড় হল। নানা রকমের পথ চলতি মানুষও জুটে গেল অল্প সময়ের মধ্যে।

গান শোনাতে একত্রে এত শ্রোতা এর আগে কোথাও পায় নি বেচারী। সেই থেকে তাই কেমন একটা আকর্ষণ জন্মে গেল জায়গাটার প্রতি। ফাঁক পেলেই, অন্য কোথাও না যাক, সেই

হোটেলটার পাশে গিয়ে উপস্থিত হত। সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধ শ্রোতার ভিড় ভেঙ্গে পড়তে দেরী হত না। ক্রমে সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার প্রধান একটা ভক্ত-মহল্লা।

অঞ্চলটা ছিল হোটেল রেঁস্তরা প্রধান আর হোটেল রেঁস্তরার বয় ধরণের শ্রোতারাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার পার্মানেন্ট ফ্যান্।

গান যখন গাইতে সুরু করত—তখনকার মত কিন্তু সে সত্যিই আত্মহারা হয়ে যেত। যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতি তাকে সহসা ভর করে নিতো। আঠারো বছর বয়সের পুঞ্জীভূত বেদনা যেন জীবন্ত হয়ে উঠত কণ্ঠে।

বেদনার রূপটা যে ঠিক কি তার হদিস সে পেত না। তবে গান একবার কোনরকমে সুরু করতে পারলে—কেমন একটা দুরন্ত আকুলতা তার বুকের মধ্যে পাক খেতো। আর তার মধ্যে থেকে আবেশের ফোয়ারা ছুটতো ফিনকী দিয়ে। আর মনটা কোথায় যেন হারিয়ে যেত! গান শেষ হলে শুধু মনে হত এই বুকটাকে অনেকখানি হাল্কা করতে পারল এতক্ষণে।

হোটেলের নীচে যে ভীড় জড়ো হত—তারা তার বয়সের গুণে নাকি গানের গুণে গুণ হতো কে জানে। তবে তারা একটু দরাজ হাতেই পয়সা দিত তাকে। ফলে অন্য মোড়ে যাক না যাক—এ জায়গাটায় রোজ দাঁড়ানোর লোভ সে ছাড়তে পারত না। ক্রমে হোটেলের বয়গুলো তাকে পয়সা দেবায় সময় হাতের তালুতে আলতো করে ইঙ্গিতময় চিমটি কাটতো কেউ কেউ। কেউবা দিত টিপ্‌নি ও ইসারা দুইই।

একদিন কায়ুম বলে একটি মুসলমান পরিচারক তাকে চোখ ইসারা করে পুরো একটা টাকা দিতে সে প্রায় মন স্থিরই করে ফেলেছিল বলতে গেলে।

পরদিন নির্দিষ্ট স্থানে আসতেই, কায়ুম তাকে হোটেলের রসুই-খানায় নিয়ে গিয়ে এক পেট খাওয়ালো। নানা রকমের বাহারী

সব খাবার পেট ভর্তি করে খেল সে। বহুদিন এরকম ভাল খাবার খায়নি বলে ক্ষুধাটাও তার বেড়ে গিয়েছিল এত।

রসুইখানাটা ফাঁকাই ছিল সে সময়। কখন যে দরজার খিল আটকে দিয়েছে কায়ুম খেয়ালই করেনি সে। আচমকা এসে জড়িয়ে ধরতে তার হুঁস হলো। নেকিয়ে নেকিয়ে বলতে সুরু করল— আমি তোকে পেয়ার করবো। তুই খুব খুব্সুরৎ আছিস্। কথা দে রাত্তিরে আসবি এখানে—

রামালু তাকে কখনও তুই বলে সম্বোধন করেনি। ঐ শব্দটা আর নেকিয়ে কথা বলা—এই দুইয়ে মিলে হঠাৎ কেমন একটা বিতৃষ্ণা পেয়ে বসল তার। এক ঝট্কায় তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সে মারল ছুট। দরজার খিল খুলে ফেলল। কায়ুম কি ছাড়ে সহজে। পেছন থেকে নাগালের মধ্যে আঁচল পেয়ে—মারল টান। বাধ্য হয়ে কথা দিতে হল—আসবে রাত্রে।

বাড়ী এসে ঠাণ্ডা মাথায় সে অনেক ভাবল। রামালুকে যে কারণে সে পরিত্যাগ করতে বদ্ধপরিকর—কায়ুমের মত লোককে আশ্রয় করলেও তো আবার সেই অবস্থাতেই পড়তে হবে।

এখনও সে রামালু ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষ জানেনা। তাই কায়ুমের শরীরের স্পর্শে গা'টা যে পরিমাণ শিরশির করছিল, তার চাইতে যেন বেশি করে অবশ করছিল একটা অব্যক্ত ভয়।

এসব সত্বেও শেষ পর্যন্ত কি হত বলা যায় না। তার পরদিনই যদি ব্রিজলালের সঙ্গে পরিচয় না হত। কায়ুমের জন্য সেই হোটেলটাকে সে দু'একদিনের মত এড়িয়েই থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু এক যায়গায় দাঁড়িয়ে বেশি পয়সা রোজগারের লোভ সম্বরণ করতে পারল না পদ্মিনী। যা হয় হবে ভেবে শেষ অবধি গিয়ে দাঁড়ালো সেই পুরোনো যায়গায়।

গান শেষ করেছে সবে। ঝপ্ ঝপ্ পয়সাও পড়ছে। পেটের কাছে সেমিজের ছেঁড়াটা কখন বেরিয়ে পড়েছে কিছু খেয়াল নেই।

গান সুরু করলে তার এই বে-খেয়াল ভাবটাকে সে কতবারই না শাসন করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ও যেন তার সম্পূর্ণ হাতের বাইরে। কোন দেবতা বা অপদেবতা কেউ নিশ্চয়ই তাকে ভর করে এই সময়টা।

চোখ তুলেই দেখে সামনে কায়ুম। উজবুকের মত হি হি করে হাসছে। তার চোখটা পেটের উপর নিবদ্ধ। তাতেই ছেঁড়া যায়গাটার কথা খেয়াল হল।

হঠাৎ একটা ভয় তাকে পেয়ে বসল। কায়ুম যদি সকলের সামনে জিজ্ঞাসা করে বসে,—পয়সা নিয়েছিস। একপেট গিলেছিস রাক্ষসের মত। অথচ কথা রাখিস নি যে বড়। তাহলে কি করবে সে।

অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল যাতে কায়ুমের চোখে আর চোখ না পড়ে।

হঠাৎ বোধ হয় ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। চোখের চাহনিকে দূরে সরাতে গিয়ে আটকে গেল অকস্মাৎ।

সাহেবী পোষাকে সুপুরুষ সুবেশ এক যুবক তার দিকেই দূর থেকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিও খেলে গেল তার মাথায়। দৃষ্টিতে ফুটিয়ে তুললো করুণ মিনতি। অনতিবিলম্বে যুবকটি তার দিকেই অগ্রসর হচ্ছে দেখে বুঝল—ব্যর্থ হয়নি তার শর নিক্ষেপ।

বুকটা অবশ্য টিপ্ টিপ্ করতে লাগল ঠিকই। কিন্তু নিমেষের মধ্যে একতলা সমান উঁচু হয়ে উঠেছিল তার সুপ্ত আত্মবিশ্বাস।

পারে, পারে, সেও পারে সুন্দর চেহারার পরিচ্ছন্ন যুবকদের আকৃষ্ট করতে। চোখে তার আনন্দাশ্রু ছিল কিনা পরখ করে দেখেনি। শুধু দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল বয়শ্রেণীর শ্রোতাদের ভিড় অবিশ্বাস্যভাবে ফাঁক হয়ে গেল। আর লম্বা লম্বা পা ফেলে তার সামনে এসে উপস্থিত হল লোকটি।

সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়ে উঠল সে। মনে হল, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি লোকটির। চোখে চোখ রাখতে গিয়ে কপালের গভীর কাটা দাগটার উপর নজর সংযত করেই খুশী থাকতে হল।

চোখটা মনে হচ্ছিল এত তেজী চোখে চোখ রাখা যায় না। বুকের ভিতরটা কেমন যেন গুর গুর করে ওঠে।

গায়ে ফেটে পড়ছে রং। ফর্সা রংয়ের উপর কনুই পর্যন্ত কালো লোমের প্রলেপ। অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল দেখতে। বিদ্যুৎপৃষ্টের মত সে স্থানু। নিজের ইচ্ছা বোধ হয় লোপ পেয়ে গিয়েছিল তার।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল সে,—লড়কী, কি নাম আছে তোমার।— ভঙ্গীটা মিষ্টি কিন্তু স্বরটা কর্কশই মনে হল চেহারার তুলনায়।

কি বলবে খুঁজে পেলো না পদ্মিনী। রামালুর সঙ্গে ঘর করেছে কম দিন নয়। কিন্তু একটা পুরুষের নিছক উপস্থিতি যে একটি মেয়েকে এমন স্থানু, এমন আচ্ছন্ন করে রাখে—এর আগে তার জানা ছিল না।

অথচ রামালুর কণ্ঠস্বর এর তুলনায় কত দয়ালু। কথা বলার সময় ঠোঁট দু'টো যখন ফাঁক হয়—কেমন যেন নৃশংস দেখায় একে।

অতিকষ্টে অনেক পরে উত্তর হাতড়ে পেল।

—আমার নাম পদ্মিনী, বাবুজী।

পিঠে আলতো করে চাপড় মারল লোকটা।

—বহুত আচ্ছা নাম। তোমার ভয়েস্ কিন্তু আরও আচ্ছা আছে এরকম মিঠা ভয়েস্ আমি শুনি নি আগে।—

পকেট থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট বার করে দিল পদ্মিনীর হাতে। নোটখানা গ্রহণ না করবার কোন চেষ্টা করল না পদ্মিনী। শুধু চোখের নত দৃষ্টি দিয়ে পায়ের নখ দেখা ছাড়া—চোখ উঁচু করার ক্ষমতা যেন আচ্ছন্ন বেচারীর।

কেউ যদি তখন তার গায়ে হাত দিয়ে অনুভব করবার চেষ্টা করত, নিশ্চিত বুঝতে পারত তার সর্বাঙ্গ তখন ঝড় লাগা শীর্ণ পাতার মত থরথর করে কাঁপছে।

ভিড় ততক্ষণে হট্‌তে সুরু করছে। সঙ্গে কায়ুমও।

—তোমার এমন গলা। তোমাকে দেখতে এমন সুন্দর। তুমি ভিক্ষা করবে কেন? না না তুমি ভিক্ষা করবে কেন?

শুধু মাত্র গান গাইবার সময় ছাড়া যা আসে না তার সাধারণত, সেই জল এসে গেল চোখে।

বলল,—ভিক্ষে করি না বাবুজী। গান গেয়ে পয়সা নিই।

লোকটি মৃদু হাসল। বল্ল,—একই কথা—

কপালে হাত দিয়ে দেখাল এবার পদ্মিনী।

—নসীব বাবুজী।

চোখে সহৃদয়তা চিক্‌ চিক্‌ করে উঠল লোকটার। কাঁধের উপর একটা টোকা মেরে কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলল এবার —ইজ্জতের সঙ্গে বাঁচবার ইচ্ছে আছে?

অবলীলায় ঘাড় নেড়ে বসে রইল পদ্মিনী। লোকটা মৃদু হাসল আর একবার।

—আমার সঙ্গে যাবার সাহস আছে?—

পদ্মিনী অনুভব করল লোকটার স্বরে এমন একটা কর্তৃত্ব যা অস্বীকার করার সাধ্য নেই তার। সলজ্জ ক'নের মত মুখ নীচু করে নথ খুঁটতে খুঁটতে এবারও ঘাড় নাড়ল পদ্মিনী।

—বেশ। সন্ধ্যেবেলায় আসতে পারবে? এই হোটেলে আমি অপেক্ষা করবো। আমার নাম ব্রিজলাল গুপ্ত।

সবশেষে পুনরাবৃত্তি করল সেই কথাটার—তোমার এমন ভাল চেহারা, এমন ভাল গলা। রাস্তায় ভিক্ষে করা কিন্তু মোটেই মানায় না তোমাকে।

ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে গেল পদ্মিনী—আমি ভিক্ষা করিনা বাবুজী। গান গেয়ে পয়সা নেই।

—ঐ একই কথা। বুঝলে ইজ্জতের সঙ্গে বাঁচবার চেষ্টা করা উচিৎ তোমার। বুঝলে ইজ্জতের সঙ্গে...

ঘাড় নাড়তে নাড়তে ব্রিজলাল যেমন গটগট্ করে এসেছিল তেমনি চলে গেল।

পদ্মিনী তার ছোট্ট হারমোনিয়ামটা তুলে গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল অথর্বের মত। যতক্ষণ ব্রিজলালকে দেখা গেল, তার হতভম্ব দৃষ্টিও তার পথের দিকে এমন ভাবে ছড়িয়ে রাখল যেন মনে হতে লাগল পদ্মিনীর গোটা মনটা বুঝিবা ব্রিজলাল তার পকেটে পুরে নিয়ে চলে গেল এইমাত্র।

॥ চার ॥

রামালু হয়ত তাকে ভালইবাসতো। কিন্তু তার ভালবাসার ধারণা যে তখন অন্য ধাতুতে গড়া।

ব্রিজলালকে সে জানে না। আর জানার তোয়াক্কা করার মত মেয়েও সে নয় তখন। তবে এটা নিশ্চিত—রামালুর চাইতে ভালবাসা কিনবার ক্ষমতা ব্রিজলালের সব দিক দিয়েই বেশি। অবশ্য তখনও সে নিশ্চিত নয় ব্রিজলাল তার ভালবাসা কিনবার জন্যই উদগ্র কিনা। তবু সে ব্রিজলালের প্রতি মধ্যাকর্ষণের চাইতে বেশি আকর্ষণ অনুভব করতে লাগল।

দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে ক্রমাগত এই আকর্ষণের ভাবটা এত বৃদ্ধি পেতে লাগল যে ছটফট করতে করতে এক সময় সে হিসাব কষতে বসল। এবং হিসাব শেষে দেখলো রামালুর প্রতি তার কোথাও কোনও বন্ধন নেই।

শুধু মেয়েটা। কিন্তু এখন তার মোটে আঠারো বছর বয়স। এখনও সময় আছে হিল্লে হবার। অন্ততঃ রামালুর চাইতে ভাল হিল্লে।

তাছাড়া মেয়ের প্রতি আনুগত্য বোধহয় তার চাইতে রামালুরই বেশি। ভেবে দেখল—একটা বাচ্চার জন্য—তা'বলে—এ সুযোগে বঞ্চিত হওয়া আর যারই চলুক তার চলবে না।

সন্ধ্যে পর্যন্ত মেয়েকে এক মুহূর্তের জন্যও কাছ ছাড়া করল না সেদিন এবং আদরও করল একটু বেশি করে।

মনের সঙ্গে লড়াই করল বহুক্ষণ। অবশেষে ভেবে আশ্বস্ত হলো—তার মাও তো তাকে ছেড়ে গিয়েছিল এমনি করে। তার তো বাপও ছিল না। তার মেয়েকে তবু তো সে একটা বাপ দিয়ে যেতে পারছে—।

মা ছাড়া সে যদি এতবড়টি হয়ে থাকতে পারে—রামালুর মেয়েও নিশ্চয়ই পারবে।

মেয়ের জন্য উপুরি আরও একটা জিনিস সে রেখে গেল। তার দিদিমার কাছে পাওয়া সিঙ্গেল রীডের হারমোনিয়ামটা।

একবার সিদ্ধান্ত করে ফেলবার পর যেমন মাকে ছেড়ে রামালুর সঙ্গে পালিয়ে আসতে তার সময় লাগেনি। তেমনি রামালুকে ছেড়ে আসতেও তার একবেলার বেশি সময় লাগল না।

ব্রিজলাল যথাসময়ে যথাস্থানেই উপস্থিত ছিল। খুঁজে বার করতে বিশেষ কষ্ট হয়নি তার।

ব্রিজলালের পাশে দাঁড়িয়ে বুকটা ভরে উঠল তার। হ্যাঁ, এতদিনে একটা মরদের মত মরদের পাশে দাঁড়াতে পেরেছে সে।

ব্রিজ সেই রাত্রেই একটা ফ্লাটে এনে তুলল পদ্মিনীকে। দিব্যি সাজানো গোছানো ফ্ল্যাট। তারপর এক সময় জিজ্ঞাসা করল পদ্মিনীকে,—এ ফ্ল্যাট তোমার পছন্দ হয়েছে তো লড়্কী।

উত্তরে আর একবার সলজ্জ মাথা নাড়া ছাড়া অন্য কিছু যোগাল না তার।

—এবার কিন্তু তোমার শরীরটাকে সাফা করা দরকার। নোংরা জামাকাপড়গুলো বদলে ফেলো। এখনও অনেক কিছু দরকার

বুঝলে, ইজ্জতের সঙ্গে বাঁচতে গেলে। আগাপাস্তালা একজন লেডী ব'নে যাওয়া প্রয়োজন।

যে পুরুষের নখের যোগ্য নয় পদ্মিনী, সে যে তার জন্য এত কাণ্ড করবে স্বপ্নেও ভাবেনি সে।

—আপাততঃ বাথরুমে গিয়ে সব চিজই পাবে। শুধু তোমার নোংরা কাপড়গুলো ছেড়ে রেখো এককোণে। যাওতো লড়কী—বাথরুমে পুরানো পরিচয়ে ইস্তফা দিয়ে এই কৌচে এসে নতুন মানুষ হয়ে বস তো। আমি চা খাবারের ব্যবস্থা করি গেস্টের জন্য।—একগাল হাসল ব্রিজলাল।

পুরোনো পরিচয়ে ইস্তফা দেওয়ায় সুখ আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু বুকের মধ্যে কেমন একটা অজানা আশংকার ঢিপ্‌ঢিপানিকে সে এড়াতে পারল না।

কলে স্নান করল। গন্ধ সাবান দিয়ে পুরানো পরিচয়ের গ্লানি বহুক্ষণ ধরে ঘষে ঘষে তুলল। পুরানো ঘাঘরা-উড়ুনি ছেড়ে ফেলে ইজ্জতওয়ালা কাপড়-জামা পরে নিপুণভাবে সাজাল নিজেকে।

শেষ পর্যন্ত কৌচে এসে বসে মনে মনে বারংবার তালিম দিতে লাগল—এবার সে এক নতুন মানুষ।—তবে বুকের ভার এবার কমল কিছুটা।

ক্রমে পুরানো জামা-কাপড়ের মত তার ফেলে আসা সদ্য অতীতকে এক সময় সত্যি সত্যি মনে হতে লাগল এক স্বপ্ন।

ঘরে তখন ব্রিজলাল নেই। কাজেই চোখ বুজে আরাম করে বসে নিল হেলান দিয়ে। হঠাৎ কি যে হল ঠিক ধরতে পারলো না। কোথা থেকে যেন একটা বেদনার ঝড় পাক খেতে সুরু করল প্রথমে বুকে। পরে গলার মধ্যে। চোখে জল এসে পড়ার উপক্রম। এত সুখ সইবে কী তার নসীবে।

ব্রিজলাল এসে পড়েছে কখন টের পায় নি সে। হাতে খাবার

আর চায়ের কেট্‌লী। টিপয়ের উপর নামিয়ে রেখেই হঠাৎ প্রায় চীৎকার করেই উঠল সে।

—বহুত আচ্ছা। এ যে দেখছি সত্যি সত্যি চিতোরের রাণী পদ্মিনীবাঈ। ভদ্দরভাবে সাজলে……

হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে আর্তস্বরে বলল পদ্মিনী,—দোহাই অত বাড়িয়ে বলবেন না। সইবে না আমার।

গম্ভীর হয়ে গেল ব্রিজলাল। তারপর মোটা গলায় বলল,—

ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে লড়্‌কী, বাড়িয়ে বলবার লোক আমি নই। বিশ্বাস না হয় বাথরুমের বড় আয়নায় নিজের নতুন চেহারাটা দেখে আসতে পার।

সত্যি কথা বলতে কি—ঠোঁটে লিপস্টিক, গালে রুজ, কপালে টিপ, ডানা-কাটা ব্লাউজে ভূষিত এই নতুন পদ্মিনীকে আয়নায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সে মুগ্ধ হয়নি এমন নয়। কিন্তু তবু নিজের চোখে নিজেকে দেখা—কে কবে পুরো বিশ্বাস করতে পেরেছে। তাছাড়া এত তার নসীবে সইবে না'য়ের ভূতটা বারংবার এমন ভয় দেখাচ্ছিল!

এরপর ব্রিজলালের কাছ থেকে যেভাবে সে ক্রমাগত রূপের স্তুতি শুনতে লাগল—অন্য মেয়ে হলে মাথা ঘুরে যেত। তার শুধু সেই ভূতটাই ছাড়ল। 'নসীবে সইবে না' এর আতংকটা তাকে রেহাই দিল কোনরকমে।

—ক্রমে বুঝবে লড়্‌কী, তোমার রূপ আর তোমার ভ'য়েস্‌ এই দুটোই তোমার আখের।

ব্রিজলাল সেদিন উচ্ছ্বসিত ভাবে এই একটা কথা যে কতবার বলেছিল তাকে সে গুণে দেখেনি।

প্রথম সেরাত্রি ব্রিজের সঙ্গেই কাটল এক ফ্ল্যাটে। কিন্তু ব্রিজ একবারও তার সুযোগ নিল না দেখে ব্রিজলালের উপর খানিকটা শ্রদ্ধাও জমল হয়ত আকর্ষণের সঙ্গে।

তুলনা করার চেষ্টা করল রামালুর সঙ্গে। এরকম এক্তিয়ারের মধ্যে পেলে রামালু কি এই ব্যবহার করতে পারতো! কি ব্যবহার করেছিল সে!

অবথা তার এই ছোট্ট জীবনে অন্য পুরুষদের সম্বন্ধে যতদূর তার জানা সে তো এর বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেয়।

হ্যাঁ, ব্রিজের হাতযশ আছে বলতে হবে। একটা কেতা দুরস্ত লেডিতে পদ্মিনীকে দাঁড় কবাতে তার পুরো একমাসও লাগেনি বলতে গেলে।

আর সে কি কাণ্ড তার। মেয়েদের দেহ-সজ্জার এত খুঁটিনাটি যে কোন পুরুষের পক্ষে জানা সম্ভব তা পদ্মিনীর ধারণার বাইরে।

ব্রিজলাল তাকে গুণ করেছিল কিনা ভগবান জানেন। নইলে ব্রিজের সবকিছু দেখে সে অমন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেত কেন। এই একমাসের মধ্যে পদ্মিনীর সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হয়েও লোকটা একবারও অশোভন আচরণ করল না দেখে প্রথম প্রথম যাই মনে আসুক— শেষটা সেই উল্টে ছট্‌ফট্ করতে সুরু করল! পরন্তু ভয়ও পেয়ে গেল খানিকটা।

সত্যিই তো এ আবার কেমন ধরণের পুরুষ মানুষ! উদ্দেশ্য কি তার! অবশেষে উন্মাদের মত একদিন রাত্রে সেই গেল ব্রিজের কাছে। তার শক্ত ফর্সা বুকের মধ্যে আত্মসমর্পণ করে বাঁচল।

ব্রিজলাল মুচকি হেসে তাকে বলল তার অনবদ্য ভঙ্গীতে— আমিও কি তোমার জন্য কম ছট্‌ফট্ করছিলাম পেয়ার!

এরপর থেকে সে বোধহয় ব্রিজলালের ইচ্ছার কাছে তার সকল ইচ্ছা অবলীলায় ছড়িয়ে, ভাসিয়ে তলিয়ে দিতে পারত। এবং সত্যিকারের দিয়েও ছিল তাই।

এর নাম ভালবাসা কিনা পদ্মিনীর জানা নেই। শুধু জানা আছে—একটি মেয়েকে বশ করবার অবিশ্বাস্য রকম ক্ষমতা রাখত লোকটা। কে জানে, হয়ত যাদুই জানত ব্রিজলাল।

রামালুর কাছে যতদিন ছিল, ভালবাসার হিসাবটা এমন করে কষে দেখবার কথা মনেও আসেনি। হয়ত রামালুর প্রতি তার আকর্ষণ ততটা রামালু বলে নয়, যতটা প্রথম পুরুষ মানুষ বলে। হয়ত ষোল বছরের পদ্মিনীর মনে বাছ-বিচারের প্রশ্নটা তখনও ওঠেনি তেমন করে।

ব্রিজলালের সঙ্গ না করলে সে কি বুঝতে পারত, রামালুর কাছে সুখ পায়নি সে। নইলে রামালুর কাছে সামান্য দেড়টা বছরই তো ফুরিয়ে ফুরোতে চাইতো না। অথচ ব্রিজের কাছে ছ'মাস যেন ছ'দিনের মামলা।

ব্রিজের সঙ্গ তাকে উন্মাদ করেছিল, সম্মোহিত করেছিল।

এই ছ'মাস পদ্মিনী চোখ তুলে ব্রিজলালকে ছাড়া চারি পাশের আর কিছুই দেখেনি তেমন করে। ব্রিজলালের ফ্ল্যাটে এমন একটা অনাস্বাদিত পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে দিন কাটতো, যে মন ভরে থাকতো সর্বক্ষণের জন্য। সে নিজেই বুঝতে পারত তার স্বাস্থ্য পর্যন্ত ফিরে গেছে এই অল্প দিনের মধ্যে।

অথবা হয়ত এরই নাম ভালবাসা। রামালু তাকে ভালবেসে বোকা বনেছিল। আর সে ব্রিজলালকে ভালবেসেছিল বলেই প্রথম ছ'মাসের মধ্যে বোকার মত চোখ তুলে ব্রিজলালকে ছাড়া আর কিছুই দেখেনি। হয়ত রামালুও তাকে ছাড়া দেখতে পেত না।

নইলে, লাগোয়া ফ্ল্যাটগুলিতে প্রতিবেশী এই সব মেয়েরা; ব্রিজলালের এই যে সব বিচিত্র রকমের নরনারীর সঙ্গে চলাফেরা;— এ সবের কিছুই তার নজরে পড়ল না কেন তেমন করে?

ক্রমে অবশ্য বুঝতে পেরেছিল একটু একটু করে—আসলে এই গোটা বাড়ীটা তার দিদিমার বস্তিরই মার্জ্জিত সংস্করণ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

প্রকাশ্যে ভালবাসা ফিরি করার রেওয়াজ এখানে নেই ঠিকই। কিন্তু নিত্য-নতুন এক বিশেষ ধরণের মুখ—সে তুমি গোপন করবে

কি দিয়ে। দিদিমার আশ্রয়ে থেকে থেকে ও মুখ দেখে দেখে তার চোখ পচে গেছে। তবে হ্যাঁ—এখানকার আগন্তুকদের মুখগুলো দিদিমার ওখানকার চাইতে ভদ্রশ্রেণীর। এবং প্রতিবেশী মেয়েদের মুখগুলিও মনে হয় তাই।

সন্ধ্যা থেকে প্রায় প্রত্যেক ফ্ল্যাটে যে গান বাজনার রেওয়াজ চলে গভীর রাত্রি অবধি—সে কী গান বাজনা শেখার স্কুল বলে! কোনো কোনো ফ্ল্যাটে তো হুল্লোড়ের নিশানা মেলে গোটা রাত্রিব্যাপী।

মাঝে মাঝে আবার এক একটি প্রতিবেশী মেয়ের মুখ বদল হয়। পুরানো মেয়েটির চেনা মুখ ফ্ল্যাট থেকে কোথায় হারিয়ে যায়। সে যায়গা অধিকার করে একেবারে নতুন একটা আনকোরা মুখ। সঙ্গে নতুন আরেকটি সেই বিশেষ ছাপ মারা পুরুষের মুখ। আশ্চর্য্য! মানুষগুলোরই শুধু তফাৎ। কিন্তু যাদের চোখ অভ্যস্ত নয়—তারা কি করে বুঝবে ছাপগুলোয় একেবারে ষোল আনা মিল।

নতুন গৃহস্থালীতে তার তখন এত সুখ, এত আচ্ছন্নতা যে—এ সব বুঝেও বুঝত না, দেখেও দেখত না। অসংখ্য মেয়ের সঙ্গে ব্রিজের ঘনিষ্ঠতা দেখে মাঝে মাঝে বুকটা কর্ কর্ করতো। তার নিজেকে মেলাতে চেষ্টা করতো—রামালুর ঘর করার সঙ্গে। আশ্চর্য! এখানে বুক করকরানিটা এক নতুন অনুভূতিই তার পক্ষে।

মাঝে মাঝে ব্রিজলাল তাকে মনের মত করে সাজার হুকুম দিত। সেও মনের মত করে যতদূর সম্ভব ডানাকাটা পরীটি সেজে নিতো। তারপর বেরুত এক সঙ্গে।

এক জোড়া সুখী দম্পতির মত কোনদিন সিনেমা, কোনদিন সমুদ্রতীর, কোন দিন মালাবার হিল্‌স্ কিম্বা কোন দিন গিয়ে উপস্থিত হত কোন দর্শনীয় স্থানের নিরালা কোণে। আর বসে বসে এক জোড়া পায়রার মত কত কি সব বক্‌বকুম্ করত!

সাধারণতঃ বলতে সুরু করত ব্রিজই।

—ছাদ আঁটা বন্ধ ঘরের মধ্যে বসে আর শুয়ে যে ভালবাসার জীবন—তাতে কি তোমার হাঁপ লাগে না পেয়ার ?

ব্রিজ ভালবাসা আর পেয়ার এই দুটি শব্দ এত অজস্র ব্যবহার করতো যে মুগ্ধ হয়ে যেত পদ্মিনী। আর মুগ্ধ হতো তার বেশ-বিন্যাসে। সর্বক্ষণ এমন ফিটফাট থাকতে পারত মানুষটি। মেম-সাহেবদের ছাপমারা বুশ সার্ট কালো প্যাণ্টের উপর—অদ্ভুত মানাত তার সুন্দর চেহারায়। আর দাঁতে কামড়ানো সিগারেটটি।

পদ্মিনীর ছায়া পড়ত ব্রিজের কালো চশমায়। সেই ছায়ার পানে মুগ্ধ চোখে চেয়ে শরীরে তার শিহরণ জাগতো।

বলতো ব্রিজের জবাবে—আলবাৎ হাঁপ লাগে।

সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে ফ্ল্যাটের নাম জানা এবং না জানা সব মেয়েদের সঙ্গে ওর অবাধ ঘনিষ্ঠতার চিত্র ভেসে উঠতো। মেয়েগুলো ব্রিজকে দেখলে এমন ছুঁক্‌ছুঁক্‌ করত—যে সন্দেহ ঘনিয়ে উঠত—শুধু তাকে নিয়ে ব্রিজলাল কি সুখ পাবে চিরকাল।

বুক ঢিব্‌ ঢিব্‌ করে উঠত আশংকায়। আর ততই গায়ে গা ঠেকিয়ে চেপে বসতো। তার চওড়া পিঠটা বেষ্টন করে বাহুর উপর আলতো করে গালটা রাখত।

এ যাবৎ এসব নিয়ে কোন প্রশ্ন করেনি ব্রিজলালকে।

আচমকা একদিন একটি নতুন বাঙ্গালী মেয়েকে এনে তুললো সরাসরি তার ঘরে। এরকমটি এই প্রথম।

পদ্মিনীর সামনেই প্রায় ভালবাসার নিখুঁত অভিনয় করে গেল মেয়েটির সঙ্গে। পদ্মিনীকে পরিচয় করাল তার বোন বলে। আর পেছন থেকে চোখ ইসারা করল তাকে। অবশ্য চোখ ইসারা না করলেও সে কথাটি বলত না।

মেয়েটি তার ফ্ল্যাটেই রাত কাটালো। আবার পরদিনই মেয়েটিকে সঙ্গে করে কোথায় চলে গেল ব্রিজলাল দিনকয়েকের জন্যে।

মুখে সে কোন ঔৎসুক্যই প্রকাশ করেনি এযাবৎ। কিন্তু বাঙ্গালী মেয়েদের চোখের মধ্যে কি একটা যেন থাকে। কিছুতেই সহজে সেটা ভোলা যায় না। বেশ কয়েকদিন যাবৎ চোখ বুজলেই সেই মেয়েটির চোখ তাকে এমনভাবে বিদ্ধ করতো।

অবশেষে অনেক ভেবে চিন্তে মুখ খুলল পদ্মিনী।

—বাঙ্গালী লড়্কীটাকে কোত্থেকে যোগাড় করলে ; আর কোথাই বা রেখে এলে পেয়ার ?

ব্রিজ বলল বটে মিষ্টি করে, কিন্তু যা বলল তার মধ্যে রইল প্রচ্ছন্ন ধমক।

—পেয়ার। ও সব জানবার চেষ্টা করে কি লাভ। ক্রমে সব আপ্সেই বুঝতে পারবে পেয়ার।

—আমাকেও বুঝি অমনি কোথাও রেখে আসবে একদিন।

—আরে তুমি আর এই সব লড়্কী। আস্মান জমিন্ পেয়ার, আস্মান জমিন্। এরা পেয়ারের আগুনে পুড়ে মরবার জন্যে যা ছট্ফট্ করে না—ঠিক একটা ফড়িং যেন।

ঠিকই বলে ব্রিজ। ও সত্যিই আগুন। পদ্মিনীও তো আজ ভিতরে ভিতরে ফড়িংয়ের মতই ছট্ফট্ করছে।

—তুমি যদি আগুন। তবে আমিও তো ঐ ফড়িংই একটা। শুধু আয়ু কিছুদিন বেশি। এইতো।

—না গো পেয়ার না। ওরা আমার কারবার। আর তুমি আমার পেয়ার। পেয়ার জিনিসটা দিলের। এটা ক'জনার সঙ্গে হয়।

পদ্মিনী পাংশু হাসি হাসলো। আর হঠাৎ নিজের অজান্তে একটা শ্লেষ শাণিত হয়ে উঠল গলায়। চোখের ভ্রূ আচম্কা কাৎ হয়ে গেল।

বলল,—তাই নাকি পেয়ার।

ব্রিজও কাৎ করে চাইল। হঠাৎ খট্কা লাগল তারও বোধহয়। এই ধরণের চোখা কথার চাবুক পদ্মিনীর মুখ থেকে এই প্রথম শোনা। তাই অবাকই হল খানিকটা। পদ্মিনীও কী অবাক হল কম।

॥ পাঁচ ॥

ব্রিজলালের ব্যবহারে ততটা নয়। কিন্তু বিভিন্ন ফ্ল্যাটের মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় যত নিবিড় হতে লাগল, ততই বেশি করে তার বোধগম্য হতে লাগল—ব্রিজলাল সহজ পাত্র নয়। এবং ফ্ল্যাটগুলোর চেহারার মধ্যে যেটুকু অস্পষ্টতা ছিল সেটুকুও ক্রমে কেটে যেতে লাগল। অতএব ব্রিজ যে শুধু তাকে নিয়েই তৃপ্ত থাকবে এমন আশা দুরাশা ছাড়া আর কিছুই নয়।

তা হোক। তবু সে হলফ করে বলতে পারে ব্রিজের সঙ্গে তার প্রথম ছ'মাসের জীবন—সে শুধু একান্ত তাদেরই। ভবিষ্যতে যাই আসুক আর ব্রিজের মনে যাই থাক।

ব্রিজের মত মানুষকেও যে সে একান্তভাবে জয় করতে পেরেছিল·—এই তার পুরস্কার। হোক তা যত কম সময়ের জন্যই।

ছ'মাস কেন ছ'দিন বা ছ'ঘণ্টার জন্য হলেও এই সুখ, এই আত্ম-বিশ্বাস রামালু কি তাকে দিত পারত কোনদিন! যাই হোক আর যাই আসুক ব্রিজের সঙ্গে তার এই দিনগুলি সে বিস্মৃত হবে কি করে!

মনে মনে যত ব্রিজের সম্পর্কে আশাভঙ্গ হতে লাগল—আশ্চর্য, কার্যতঃ ততই ব্রিজকে তুষ্ট করার চেষ্টা বাড়তে লাগল। অবশ্য সেটা যে নিজে সে পরিষ্কার বুঝতে পারত এমন নয়।

যত দিন যেতে লাগল ফ্ল্যাটে রাত কাটানোর সময় কম পেতে লাগল ব্রিজ। ক্রমশঃ পদ্মিনীকে নিয়ে মাতামাতি করার ঘটনাও কমে আসতে লাগল। পদ্মিনী অনুভব করত এগুলো কিসের ইঙ্গিত।

কিন্তু বুকটা তবু জ্বালা জ্বালা করত। আর সে নিজেকে নিজেই প্রবোধ দিত। ব্রিজ একটি শুধুমাত্র জেনানার ভালবাসা

কিনেই তৃপ্ত থাকবে চিরকাল—এটাই বা পদ্মিনীর মত মেয়ে ভাবতে পারে কি করে!

আসলে ব্রিজের সম্মোহন থেকে তার বিন্দুমাত্র মুক্তি ঘটেনি তখনও। ব্রিজের যে কোন ইচ্ছা সে পূরণ করতে না পারা পর্যন্ত যেন স্বস্তি পায় না কিছুতেই। ওকে হারানোর ভয় যতই বাড়তে লাগল এ ভাবটা যেন তাকে ততই গ্রাস করতে সুরু করল।

কথায় বলে বিয়ে না করলেও বরযাত্রী সে গেছে। যেতে তো আর মানা নেই কারও।

সত্য কথা বলতে কি—অতীত তার একেবারে নিরামিষ কাটে নি। রামালুও যে নেহাৎ নিরামিষাশী ছিল এমন নয়। তবে তার ছিল তাড়ির ওপর বেশি টান। তাও সপ্তাহান্তিক।

তারই সঙ্গে কদাচিৎ কখনও মদের নেশাও করেছে সে।

কিন্তু ব্রিজের মন রাখতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সেই মদের নেশা জিনিসটাকেই করতে হয়েছিল মজ্জাগত।

প্রথম যেদিন বোতল সরাসরি ঘরে নিয়ে এল ব্রিজ—পদ্মিনী ভাবতেও পারেনি তার মতলব কত গভীর।

যথা সময়ে ব্রিজ দু'টো পাত্রে মদ ঢালল দেখে একটু অবাক হচ্ছিল মনে মনে।

ব্রিজের সম্বোধনে ভুল ভাঙ্গলো। একটা গ্লাস ওর সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল,—জান পেয়ার। সরাব ছাড়া মহব্বতে সুখ নেই।

কথার চালাকি খেলতে গিয়েই কাল হল। শুনে ভান করে হাসতে হাসতে যেন গায়ে ঢলে পড়ল পদ্মিনী।

বলল—লেকিন পেয়ার, সত্যিকারের মহব্বত না হলে তোমার সরাবেও সুখ নেই।

ব্যস্! আর যায় কোথা। সুযোগ পেয়ে ব্রিজও ধরল চেপে, —আমাকে তুমি সত্যিকারের মহব্বত কর কি কর না?

—আলবৎ করি, একশোবার করি,—ঝেঁকে উত্তর দিল পদ্মিনী ভগবান জানেন এই জবাবের কতটা ভান আর কতটা সত্যি। তবে এটা সত্যি সেদিন সে ব্রিজকে সরাসরি চটাতে চায় নি। তাই কথার চালাকি দিয়ে পরিস্থিতি এড়াবার চেষ্টাই ছিল প্রধান।

—এ গ্লাস তবে তোমার। যাচাই করে নাও সরাবে সুখ আছে কি নেই। তোমার মহব্বত সত্যিকারের না ঝুটা।—

কিন্তু সেটাই হল কাল। ব্রিজ তার চাইতে অনেক সেয়ানা মানুষ।

মুস্কিলে পড়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নাক টিপে গিলতে হল সেদিন। বলা বাহুল্য সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজও।

মহব্বত ঝুটা না সাচ্চা—বুঝবার মত সুযোগ তার হয়নি অবশ্যি। কিন্তু এরপর ব্রিজের সঙ্গে মহব্বতে সরাব ছাড়া সুখ হবার নয়—সেটা বুঝতে পারল।

অতঃপর ফ্ল্যাটের গা আলমারীতে দু'চারটে সরাবের শিশি প্রায় সব সময়ের জন্যই জমা রাখতো ব্রিজ—বিনা দ্বিধায়। কে জানে—হয়ত বা পদ্মিনীর নেশার বাধ্যতাকে পাকা করার জন্যই।

শেষটা ঘটনা এমন দাঁড়াল—ঘরে যেদিন শিশির অভাব হোত—ব্রিজ পদ্মিনীকে নিয়ে হোটেলে হাজির হোত। তারপর একসঙ্গে দু'জনে ফিরত মাতাল হয়ে।

ফ্ল্যাটে ফিরে ব্রিজ তার গলা হাত দিয়ে বেষ্টন করে মুখের উপর মদের ঢেকুর তুলে চোখ ঢুলু ঢুলু করে সোহাগ করত—কি পেয়ার, সরাব না হলে কি মহব্বতে সুখ আছে—বল!

সেও পাল্টা চোখ ঢুলু ঢুলু করে জবাব দিত,—মহব্বত আছে বলেই তো সরাবে এত সুখ পেয়ার।

মাঝে আবার কিছুদিন ডুব মেরে সে কোথাও কাটিয়ে এল কে জানে। কিন্তু এবার ফেরার পর এমন কাণ্ড সুরু করল—এর আগে করেনি কোনদিন।

হঠাৎ সন্ধ্যায় চার পাঁচজন ইয়ার বন্ধু আর চার পাঁচটা বোতল বগলে করে এসে সরাসরি হাজির হল তার ফ্ল্যাটে।

বলল,—আসর বসবে।

পরে অবশ্য এইসব ইয়ার বন্ধুদের সে জেনেছিল ভাল করেই।

সেদিন অবশ্য ভ্রূ কুঁচকেই জিজ্ঞাসা করল,—আসর আবার কিসের ?

—কেন তোমার গানের অমন গলা দেখেই তো মজেছিলুম। বন্ধুদের শোনাব বলে কথা দিয়েছি।

শঙ্কিত হল পদ্মিনী। একবার মৃদু আপত্তিও করল।—

আমাদের ফ্ল্যাটে তো গানবাজনার আসর বসেনি কোনদিন।

মাথা নেড়ে বলল ব্রিজ,—বসবে, এখন থেকে বসবে।

বুঝলো পদ্মিনী ব্রিজ ঠিক প্রকৃতিস্থ নেই। ইয়ার বন্ধুরাও হি হি করে হেসে উঠলো।

এ ফ্ল্যাটে গান সে গাইতে পারে। কিন্তু সে তো শুধু ব্রিজের জন্যই। এই ফ্ল্যাটে বসে সে সবার জন্য গান গাইবে, একথা ভাবতে ইজ্জৎ কেমন যেন খচ্ খচ্ করতে লাগল। কিন্তু আজও সেই দুর্বলতা। তখনই ব্রিজের সঙ্গে কথাকাটাকাটি করতে চাইলো না সে। ব্রিজ ইতিমধ্যে একটা হারমোনিয়ম ও ডুগিতবলা যে এনে রেখেছিল,—ও হরি—তার আসল অর্থ তা হলে এই !

হারমোনিয়াম তাক থেকে নামাতে গিয়ে বারংবার মনে হল, আর একজন কেউ সজোর মুষ্টিতে তার অনিচ্ছুক হাত দুটোকে যেন নাড়িয়ে নিচ্ছে বার বার।

অত্যন্ত অনিচ্ছুক ভাবেই সে সেদিন গান গাইতে বসলো। কিন্তু সেই ব্যাপার। একবার সুরু করলে সেই নিজেকে হারিয়ে ফেলা।

ইয়ার একজন ডুগিতবলা ধরল। তারাও অবশ্য হারিয়েছিল নিজেদের। তবে সেটা সম্পূর্ণ পার্থিব কারণে।

মাঝে মাঝে তার মুখের সামনে গ্লাস এগিয়ে ধরার খেয়ালটুকু হারায় নি শুধু ব্রিজ।

সুরু করার বেলা যতই দ্বিধা থাক, মনের ময়লা পরিষ্কারের খুব একটা দেরী হয়নি। শেষ পর্যন্ত কত রাত্তির অবধি যে বিনা দ্বিধায় সাফামনে গান-বাজনা চলেছিল তার হিসাব ছিল না সেদিন। তারপর গানের শেষে সবার হুল্লোড়ের সঙ্গে যখন সেও গলা মেলালো—তখন ঠিক প্রকৃতিস্থ ছিল কিনা বলা মুস্কিল।

পরদিন সকালে অবশ্যি পুরো প্রকৃতিস্থ অবস্থাতেই ঘুম ভাঙ্গল। ঘুম-ঘুম ভাব ভাল করে কাটতে না কাটতেই স্মরণে এল গত রাত্রের গান-বাজনার আসরের কথা। আর বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মত একটা দাহ অনুভব করল সে। ধীরে ধীরে একটা জ্বালা যেন পাক খেয়ে উঠতে লাগল সারা সম্বিতের মধ্যে। ক্রমে ছড়িয়ে পড়তে লাগল সারা চেতনায়। হঠাৎ একটা বিদ্রোহ যেন ঘনিয়ে উঠতে চাইল তার সত্বার মধ্যে—সমস্ত সংযমকে তুচ্ছ করে।

শেষ পর্যন্ত ব্রিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সে বিদ্রোহের ভাবটাকে কিছুতেই যেন আর বাগ মানিয়ে রাখতে পারে না সেদিন। তবে কি মাত্র এক রাত্রির মধ্যেই ব্রিজের সম্মোহনের শক্তি তার উপর আর তেমন কাজ করতে পারছে না!

ধীরে ধীরে যত সে বুঝতে পারছে—এ কোন দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে—তত রাগে, ঘৃণায়, ক্রোধে তার শরীর নিশপিশ করতে থাকে। দাঁতে দাঁত চেপে বারংবার সে সম্বরণ করল সেদিন নিজেকে।

কিন্তু বিকেলে আগের দিনের মতই পুনবায় প্রস্তাব করল ব্রিজ।

বল্ল,—আজও গান হবে তো তোমার—পেয়ার।

ভাবটা এই যেন সে অনুমতি চাইছে। কিন্তু আসলে যে ওটা হুকুম তা পদ্মিনীর জানতে বাকী নেই। শরীরটা রি রি করে উঠল। জানে,—না!—ঘাড় বাঁকিয়ে শক্ত করে রইল সে। চোখে আনল করেনি ধের ছোবল।

চমকে উঠল ব্রিজ—সাপের ফণা দেখার মত। চোখ দুটো স্থির করে, ভাল করে লক্ষ্য করল সে পদ্মিনীকে। তারপর গম্ভীর অথচ প্রচ্ছন্ন শ্লেষজড়িত কণ্ঠে বলল,—তুমি কি বুঝতে পারছ না পেয়ার—এ সব তোমারই আখেরের জন্য।

পদ্মিনী নিরুত্তর। তার অনুগত চোখ দুটির মধ্যে শানিত হিংস্রতা যে কিছুতেই মিলিয়ে যাচ্ছে না—তা ব্রিজের দৃষ্টি এড়াল না।

—হাঁ হাঁ তোমার আখেরের জন্যই। রোজগারে নামবার আগে তুমি যত সুযোগ পাচ্ছ, কোন মেয়েই এত পায় না পেয়ার। কিছুদিন কাটুক—তুমি নিজেই বুঝতে পারবে—এ সব গান-বাজনার আসরের মধ্যে দিয়ে যে ট্রেনিং—তার দাম কতখানি!

ব্রিজের নিশ্চয়ই পদ্মিনীর উপর দুর্বলতা জমেছিল কিছুটা। নইলে আর কোন মেয়ের বেলাতেই—আসল কথাটাকে প্রস্তাবাকারে উত্থাপন করতে এত দিন লাগে নি। এত বায়নাক্কারাও প্রয়োজন হয়নি! অনেকের ক্ষেত্রে মৌখিকাকারের কোন প্রস্তাবেরই তোয়াক্কা করেনি সে।

ব্রিজের উপর পদ্মিনীরও তো দুর্বলতা কম নয়। ব্রিজের জন্যে এখনও হয়ত সে এর চেয়েও ভনায়ক কাজ করতে পারে। কিন্তু এ ভাবে জীবন কাটানোর কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

সেটা অন্য কোন মহৎ কারণের জন্য নয়। সেটা এই কারণে যে তার গোটা বাল্য ও কৈশোর যে কেটেছে এই ধরণের মেয়েদের মাঝে। সেই সব অভিজ্ঞতার কথা কি করে ভুলবে সে! কি করে ভুলবে সে—শেষ পর্যন্ত ব্যাধি আর কষ্টের কি নরক যন্ত্রণাই ভোগ করে তারা।

বহু দুর্ভাগিনীর চিত্রই তো তার চোখের সামনে ভাসে।

তার দিদিমার ঘর থেকে বেরিয়ে প্রথম ঘরে থাকতো সেই পার্শী মেয়েটা। গোলাপের মত ছিল তার গায়ের রং। শেষে যখন কুষ্ঠ ধরল—ঘর ছেড়ে পথেই দাঁড়াতে হয়েছিল তাকে। পরে কতদিন

সে দেখত—রাস্তার মোড়ে সর্বাঙ্গে পট্টি বাঁধা অবস্থায় সারাদিন মানুষের করুণা ভিক্ষে করতে হত বেচারীকে।

অথচ রুগ্ন দেহ বলে একমাস আগেও কি সে রেহাই পেয়েছিল! ব্যাধিটা তখনও এমন নিষ্করুণ ভাবে ফুটে বেরোয় নি। নাকটাই শুধু বোঝা যেত। তাও দিনের আলোয়। নিরাভরণ শরীরে।

একদিন এলো চারজন মাতাল জাহাজী একসঙ্গে। বিকিকিনির দরজা থেকে বাছাই করল ওকে হয়ত গায়ের রংয়ের জোরেই। বলল, —কি গো মেয়ে, বসাবে নাকি গো?

—সবাই বসবেন বাবুজী?

—যদি বসিই—হেঁচ্‌কি তুলে বলল ওদের মধ্যে একজন।

—আমরাও মানুষের বাচ্চা বাবুজী।

করুণ উত্তরেও কি জ্ঞান হয়েছিল পুরুষগুলোর। পুরুষেরা কি সাংঘাতিক! সেই বোধহয় তার শেষ দিন—বিকিকিনির দরজায় দাঁড়ানোর।

কিম্বা সেই উড়িয়া মেয়েটি। গোলাপী ছিল যার নাম। গোলাপী পান খেত খুব। দগ্‌দগে ঘায়ে সারা গা ছিল তার বিষাক্ত। মধ্যে মধ্যে রোগটা কমত বাড়ত। সারাদিন জ্বরে ভুগত। কিন্তু সন্ধ্যায় রেহাই পেত নাকি গোলাপী।

কিছু চিকিৎসার পর ঘায়ের উপশম হল তো চোখ ধরল। উপর থেকে যেমনকার চোখ তেমনিই রইল। কিন্তু দৃষ্টি শক্তিটি গেল খোয়া।

শেষটায় দাঁড় করিয়ে দিতে হত বেচারীকে। পানের রসে ঠোঁট লাল করে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকত গোলাপী চক্ষুষ্মানের ভান করে। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হলেও অভিনয় কুশলতার গুণে উপর থেকে চট্‌ করে বুঝবার সাধ্য ছিল না কারও।

কিম্বা সেই পাঞ্জাবী মেয়েটি। অমৃতকুমারী যার নাম। কী বিরাট চেহারার কাঠামো ছিল তার। খুব নিকট থেকে না দেখলে বোঝাই যেত না যে অত বয়স হয়েছে।

পরনে থাকত পায়জামা শালোয়ার। তার ঘরেই ভিড় হত বেশি। তার ডাগড়াই শরীরটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে ঝাঁঝরা না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সেও কি রেহাই পেয়েছিল!

সবাই জানতো মুখ দিয়ে তার রক্ত উঠতো। শেষটায় দিনরাত শরীরে ঈষৎ জ্বর থাকত তার। উজবুক পুরুষগুলো তাতেই যেন খুসী হত বেশি। জেনানার গায়েব রক্ত এ রকম টগ্‌বগ্‌ করে না ফুটলে—সে আবার জেনানা!

সেই গায়ের রক্ত টগ্‌বগ্‌ করা জেনানা—অমৃতকুমারী—কি তার পরিণতি! আজও ভাবতে গেলে সমস্ত শরীর তার হিম হ'য়ে ওঠে।

আগের দিনও যথারীতি সে বিকিকিনিব দরজায় দাঁড়িয়েছে। ঘরের সেই বাজুভাঙ্গা খাটে অতিথি বসিয়েছে।

হঠাৎ সেদিন ভরসন্ধ্যেবেলায় একটু একটু চিন্‌ চিন্‌ করতে লাগল বুকের মধ্যে। ক্রমে সেটা একটা যন্ত্রণা হয়ে ধোঁয়াতে লাগল।

রোজকার মত সেদিনও বিকেল থেকে প্রস্তুত করেছে নিজেকে। বেলা পড়ে যেতে গা ধুয়েছে। হাতে মুখে ঘাড়ে গন্ধ সাবান ঘষেছে। মুখের কর্কশতাটুকু আড়াল করবার জন্য সস্তা প্রসাধনের প্রলেপ মেখেছে আধ ঘণ্টা ধরে। চোখ এঁকেছে। মনের মত করে ভ্রূ এঁকেছে। শেষে ভাঙ্গা হাত-আয়নাখানা মুখের একান্ত কাছে এনে টিপ পরেছে। আর মুচ্‌কী মুচ্‌কী হেসেছে নিজের প্রতিচ্ছবির দিকে তাকিয়ে।

পোষাক বদলানোর আগে, ঘর বিছানা, ছিমছাম করে গুছিয়েছে। রোজকার মত হারিকেনটা কালিমুক্ত করেছে। তেল ভরেছে। তারপর ঠিক দরজার পাশটিতে রেখেছে। হারিকেনের মাথার উপর দেশলাইটা রাখতেও ভোলেনি। এরপর পোষাকটা বদলে আর একটুখানি অন্ধকার হবার অপেক্ষা।

হঠাৎ সেই যন্ত্রণাটা। ওটা পুরানো। মাঝে মাঝে হয় তার। গা সওয়া। প্রথমটা আমল দেয়নি তেমন। গ্রাহ্য না করে

সেই অবস্থাতেই রোজকার মত নাগরের বেশবাস অঙ্গে চড়ালো অমৃতকুমারী।

কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই বুকের মধ্যেকার ধোঁয়ানো যন্ত্রণা এমন তীব্র যন্ত্রণায় পরিণত হল—যে দরজা পর্যন্তও এগিয়ে যেতে পেরে উঠল না সে।

নিজ হাতে সাজানো বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল দাঁতে দাঁত চেপে।

সেই উপুড় হওয়া অবস্থাতেই দরজার একফালি ফাঁক দিয়ে বাইরে নজর পড়ল। বিকিকিনির দরজা সরগরম হতে সুরু করেছে ইতিমধ্যে। গোলাপী, সেই পার্শী মেয়েটি, সবাই যার যার ধান্দায় ব্যস্ত। চীৎকার করলেও কি কারও সময় আছে তখন, তার পাশে এসে দাঁড়ানোর!

দিনমানের নিশুতি কেটে সন্ধ্যার ভিড় সবে কিলবিল করতে সুরু করেছে বাড়ীতে। দুহাতে আরো জোরে বিছানার চাদর চেপে ধরল সে। দম বন্ধ করে বুক আরো জোরে বিছানার সঙ্গে চেপে ধরবার চেষ্টা করল!

যন্ত্রণার ধমকে ক্রমশঃ হয়ত মুখ নীল হয়ে উঠল। তবু একটাও টু শব্দ করল না। কে জানে, হয়ত ঠিক পাশের ঘরের গোলাপী, কিম্বা সেই পাশা মেয়েটি, কিম্বা তার চব্বিশঘণ্টার প্রতিবেশিনীর সব মেয়ের প্রতিই সেই মুহূর্তে একটা দুস্তর অভিমানে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল অমৃতকুমারীর অন্তর। কিম্বা হয়ত তাও নয়।

হয়ত, রোজকার মত সেই কেবল বিকিকিনির দরজায় দাঁড়াতে পারল না—শেষ মুহূর্তে—এই আর্তিতেই তার মন বেশি ছট্‌ফট্ করেছিল।

অনেকদিন পর সেই রাত্রেই তার সর্বক্ষণের সাথী জ্বর জুড়োল। আর বোধহয় তার হাড়ও। ঘরের মধ্যে সবার অজান্তে কখন মরে রইল—রাত্রি নিশুতি হবার আগে কেউ তা জানতে পারেনি। শুধু দিদিমা আর দু একজন ছাড়া।

নিজ হাতে যত্ন করে সাজানো বিছানায় সারারাত্রি অমৃতকুমারীর মড়া চাপা পড়ে রইল। পরদিন বাড়ীশুদ্ধ মেয়েরা যখন জানতে পারল—কেমন একটা ভয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল গোটা বাড়ীটা।

গায়ের রক্ত টগ্‌বগ্‌ করা যে জেনানার পাশে সন্ধ্যা হতে মাছির মত ভন্‌ভন্‌ করতো মানুষ তার শেষকৃত্য করার লোক জোটাতে দিদিমার প্রায় সেদিন জিভ বেরুনোর উপক্রম।

এই তো পরিণতি!

এসব কথা যত মাথায় আসছিল পদ্মিনীর—মড়ার মত ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিল মুখের রং। না না না! ব্রিজের জন্য আরও গর্হিত, আরও নীচ কাজ করতে সে রাজী। তবু এই হতভাগা ইজ্জৎহীন ভাগাড়ের জীবন—কিছুতেই নয়।

তার মুখের মাংসপেশী দৃঢ় হয়ে উঠছিল। নাকের কোল ফুলে ফুলে উঠছিল একটু একটু। ফোস্‌ ফোস্‌ শব্দ করে নিঃশ্বাস পড়ছিল।

সেদিকে লক্ষ্য করে ব্রিজ সতর্ক হয়েছিল কিনা কে জানে। কাছে সরে এসে মোলায়েম করে বলল—ব্রিজলাল,—ব্রিজ তোমারই থাকবে পেয়ার। কিন্তু রোজগার তো তোমাকেই করতে হবে নইলে কে খাওয়াবে তোমাকে। মানে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানই তো হল আসল ইজ্জৎ। কি বল এ্যা?

—অসম্ভব। অসম্ভব। আমি চুরি করতে পারি। ভিক্ষে করতে পারি। চাইকি আরও নীচ কাজ করতে পারি। কিন্তু দোহাই তোমার—আর কিছু মুখে এনো না।—উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে লাগল পদ্মিনী।

ব্রিজ চট্‌ করে গম্ভীর হয়ে গেল। বলল,—ভিক্ষেও চাইনা, চুরিও চাইনা। আর ব্রিজলালকে সাদি করবে বলেও তো তুমি তার পিছন পিছন আসনি। জাদা ফ্যাচ্‌ ফ্যাচ্‌ না করে যা বলি তাই কর।

ব্রিজের চোখের দিকে তাকিয়ে পদ্মিনী সত্যিই আজ আশংকিত হল। ধূর্ততার সঙ্গে একটা নিষ্ঠুরতা চিক্‌ চিক্‌ করেছে চোখে। আর

ঠোঁটের ফাঁকে সেই নৃশংস ভাব। পাদ্মিনীও যেন কেমন মরিয়া হয়ে উঠল। এতদিন বোধহয় একটা ঘৃণা জাগ্রত করতে পেরেছে সে।

হঠাৎ চীৎকার করে উঠল বুনো মোরগের মত ঘাড় টান করে—হ্যাঁ আমিও তোমার সাদি করা জেনানা নই জানবে। যে—যা বলবে তাই করব। জীবন থাকতে ও লাইনে নিতে পারবে না তুমি।

ব্রিজলাল বোধহয় চমকে গেল। কোন জবাব দেবার চেষ্টা না করে কোমরে দুটো হাত রেখে টান হয়ে দাঁড়াল মিনিট খানেক। তারপর সামনে এগুল একপা দু'পা করে। ঠোঁট দুটি ঈষৎ কুৎসিত ভাবে ফাঁক করে সমস্ত চেহারায় একটা অদ্ভুত পাশবিকতা ফোটাল। ঠিক যেমন এগোয় শিকারের সামনে কোন মাংসাশী চতুষ্পদ।

পদ্মিনী ভাবতে পারেনি তখনও বিন্দুমাত্র। বাঁ হাতে ঠাস্ করে এক চড় কসিয়ে দিল ওর ডান গালে। মাথা ঘুরে গেল পাদ্মিনীর। দেয়াল ধরে সামলে ফেলল কোন রকমে। অপ্রস্তুত ছিল বলে জিভ কেটে গেল দাঁত লেগে। টাল সামলাতে কয়েক মিনিট লাগল তার।

পদ্মিনীও ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাবার মেয়ে নয়। তাছাড়া খাদে পড়ে যাবার আগে বোধহয় ঘাস ধরেও বাঁচবার চেষ্টা করে মানুষ। অন্ধের মত দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে সেও পাল্টা ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্রিজের উপর।

ব্রিজের পক্ষে এ প্রতিআক্রমণ অপ্রত্যাশিত একেবারে। তাই সেও ছিল অপ্রস্তুত। আচমকা আঘাতে সে পড়ে গেল মেঝেয়। তারপর চলল কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি। ব্রিজ শুয়ে শুয়েই হাত চালাতে লাগল। আর চেষ্টা করল চুলের মুঠির প্যাঁচে ফেলবার।

কিন্তু পদ্মিনীও বুঝিয়ে দিল সেও নেহাৎ অবলা নয়। আর কিছু না থাক দাঁত আর নখের ব্যবহার ভালভাবেই জানে সে। একটা চোখ ব্রিজের তো কানা হবারই উপক্রম। ব্রিজের ডান বাহুর খানিকটা মাংসল স্থান—পদ্মিনীর ধারালো দাঁতের ঘায়ে এমন ঘায়েল হল—যে তখনকার মত রণে ভঙ্গই দিতে হল বেচারীকে।

ধূর্ত ব্রিজ লড়াইয়ের মাঝখানেই হঠাৎ গলার স্বর পাল্টে ফেলল দেখে পদ্মিনী অবশ্য প্রথমটা অবাকই হল কিছুটা।

—কি ছেলে মানুষী কর পেয়ার। ছাড় দিকিনি, ছাড়।—

পদ্মিনী বাহুতে গাঁথা দাঁত তুলে নিয়ে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল—ইস্ পেয়ার। থুঃ থুঃ থুঃ!—মাথায় যেন খুন চেপে গেছে তার।

হয়ত তার এই নৃশংস শয্যাসঙ্গী তার লড়াইয়ের ক্ষমতা দেখে অবাকই হয়ে থাকবে। অথবা হয়ত যে শিকারের পিছনে এতদিনের শ্রম ও পয়সা ব্যয় হয়েছে—পুরোপুরি সে হাতের বাইরে চলে যাক—ব্রিজ চায়নি।

তাই গায়ের ধুলো ঝেড়ে রুমাল বার করল পকেট থেকে। বলল,—ইস্! বাঁধ তো হাতখানা। কুত্তার মত কামড়ে এক থাব্‌লা মাংস তুলে নিয়েছো একেবারে।—যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁতে চাপছে কেবল ব্রিজলাল।

ঘাড় টান করাই ছিল পাদ্মনীর। ফোঁস করে উঠল সে,—না তুলে নেবেনা। পেয়ার করবে। আর মার খাবে কুত্তার মত।

শেষ পর্যন্ত ফয়সালা একটা হয়ে গেল সেদিনই। ব্রিজ উদাস সুরে একসময় বলল,—ঠিক আছে পেয়ার। ভিক্ষে যখন তোমার নসীবে লেখা। কে বাধা দেবে। তবে হ্যাঁ—রোজগারের অন্ততঃ আধাআধি বখ্‌রা তো দেবে। এতকাল ভিক্ষে থেকে রেহাই করিয়ে খাওয়ালাম, পরালাম, জেনানার মত জেনানা তৈরী করলাম। তার একটা দাম আছে বল।

পদ্মিনী তার এই অবিশ্বাস্য জয়ে তখন এতই খুসী যে বখ্‌রার হিস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজী নয়। নিজের খুসীতে সে গান বানাতে পারবে। রাস্তায় রাস্তায় সে গান ফিরি করতে পারবে। এই তো যথেষ্ট। নিত্য ভালবাসার পশরা সাজিয়ে বসে থাকার সেই হতভাগ্য গ্লানিময় জীবনের বিভীষিকা থেকে সে সম্পূর্ণ মুক্ত।

তাছাড়া ভিতরে ভিতরে হয়ত ব্রিজের উপর দুর্বলতার কিছুটা তখনও বাকী ছিল। এই ঘর যেমন আছে তেমন থাকবে। যেমন ব্রিজ তার শয্যাসঙ্গী তেমনিই থাকবে। কিন্তু জীবিকায় সে স্বাধীন। চলবে ফিরবে তার আপন খুসীতে। আর কি চাইতে পারে তার মত মেয়ে। ব্রিজ তারই কিন্তু সে ব্রিজের অধীন নয়।

॥ ছয় ॥

এক দুর্ভাগ্যকে এড়াল বটে। কিন্তু শেষের দিকে আরও কত বড় দুর্ভাগ্যের পাকে সে শতগ্রন্থিতে জড়িয়ে ফেলেছিল নিজেকে সেই হুঁস পদ্মিনীর সহজে আসেনি। এবং শোভার আত্মহত্যার ঘটনা চোখের সামনে না দেখলে, কোনদিন তা আসত কিনা কে জানে।

ব্রিজের সর্তে পদ্মিনী সম্মত হওয়ায়—মনে মনে ব্রিজ সেদিন হেসেছিল হয়ত।

প্রায় দু'টি বছর সে কাটিয়েছে ব্রিজের সঙ্গে। আবার হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে গান ফিরিটাকে করে তুলল তার পাকাপোক্ত পেশা। বাহ্যতঃ পেশাটা খুবই নির্দোষ। একটি দুঃখী মেয়ের নির্ভেজাল ভূমিকাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বম্বের অন্ধকার নগরীর এমন কোন নরক নেই—ব্রিজের প্রতি দুর্বলতাবশতঃ—যা সে গুলজার করে ফেরেনি।

সত্য কথা বলতে কি—ধীরে ধীরে নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রায় এই সব নরকের একজন সক্রিয় অংশীদারই হয়ে উঠতে হয়েছিল পদ্মিনীকে।

গান ফিরিকে পেশা করার আগে সে পোষাক পরিবর্তন করে সেই পুরানো ঘাঘরাই ধরল। সময়টা বিশেষ করে নির্বাচন করেছিল দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিক।

নিজে নিজে কত গানই না বানিয়েছিল এই সময়। একটা ঝোঁকই উঠেছিল তার গান বানানোর। নিজেই বানাত সুর। তার গানে ছিল অপরূপ যাদু।

নিজের জীবনের সমস্ত বেদনা আর দুঃখ সব যেন উজাড় হয়ে যেত গানের মধ্যে। কারুণ্যে টলমল করত সঙ্গীত। আর ভোরের আল্‌তো আল্‌তো কুয়াসার মত তা ছড়িয়ে পড়ত শ্রোতাদের অন্তরে। আর সে নিজেও যেত হারিয়ে। গঙ্গাস্নানের পর ধর্মার্থীদের মনে যেমন পবিত্রতা উড়তে থাকে। গানের গঙ্গায় হাবুডুবু খেয়ে সারাদিনের গ্লানি আর দুঃখকে মুক্তি দিয়ে সেও তেমনি হাঁপ ছেড়ে বাঁচত।

কারুণ্যের গানই ছিল তার বৈশিষ্ট্য। তার শ্রোতারাও বিশেষ বিশেষ রাস্তার মোড়ে তার এই কারুণ্যের গানে ভিজবার জন্য অপেক্ষা করত।

প্রথম কিছুদিন ব্রিজের তরফ থেকে কোনরকম হস্তক্ষেপই আসেনি তার স্বাধীন গান ফিরি করার পেশায়। অবশ্য যখন এলো এমন সুকৌশলে এলো—পদ্মিনী ভাল বুঝতেই পারেনি, বিষয়টির প্রকৃত অর্থ।

অবশ্য পদ্মিনীর মত মেয়ের পক্ষে এই না বুঝতে পারাটা খুব অস্বাভাবিকও নয়।

যে মেয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছে নরকে। অসুস্থ মানুষ ছাড়া যে সঙ্গী পায়নি সারা জীবন। গানের মাধ্যম ছাড়া, যে জীবনের দুঃখ ও অশ্রুর অনুভূতির হদিশ পায় না। তার কাছে এর চাইতে বেশি আশা করা হয়ত একটু বাড়াবাড়িই।

তাছাড়া যে সব ঝানু অপরাধীদের সঙ্গে তার তখন ঘর—তাঁদের তুলনায় বয়সে সে অনেক কাঁচা, বুদ্ধিতেও অপরিণত। সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য অপরাধীদের একজন নেতা বেচারীর মনের মানুষ।

যাকে সে পুরো বিশ্বাস করে না। অথচ যার সঙ্গে সে ঘর করে। আর সঙ্গ করে হৃদয়ের সতর্কতা সর্বদা জাগরুক রেখে। এবং মনের মানুষের কাছে বিশেষতঃ মেয়ে মানুষের সতর্কতা কখন কোন সূত্রে শিথিল হয়ে যায় কেউ বলতে পারে কখনও!

নইলে যে ব্রিজের সঙ্গে সে লড়াই করতে পিছপাও হয়নি—অল্পদিনের মধ্যে তার ভগ্নদূতে পরিণত হল কি করে।

মদটা ইতিমধ্যে দৈনন্দিনের নেশায় পরিণত হয়েছিল। গান ফিরি করার পর ব্রিজের বখ্‌রা মিটিয়ে দিয়ে যেদিন নেশার পয়সা কুলোত না সেদিন বিশ্রী লাগতে সুরু করল। সুযোগ বুঝে ব্রিজও নতুন প্রস্তাব আনল সুকৌশলে।

সোহাগটা সেদিন একটু বাড়ল। ব্যবহারটাও উদার হল। সেদিন নিজের পয়সায় পদ্মিনীকে নেশা যোগাতেও কোন দ্বিধা দেখাল না ব্রিজ।

নেশা একটু জমতে তবে সোহাগের ডোজ্‌ আরেকটু বাড়িয়ে দিল ব্রিজ। আস্তে আস্তে ব্রিজের কাঁধে মাথা রাখল পদ্মিনী। বলল,—তুমিই তো বলেছিলে পেয়ার, সরাব নইলে মহব্বত জমে না। আজ আমারও তাই মনে হয়।

ব্রিজ বলল,—পেয়ার আমার কিন্তু আজকাল উল্টোটাই মনে হয়। সেই যে তুমি বলেছিলে মহব্বত ছাড়া সরাবে সুখ নেই।

দু'জনে খিল খিল করে হাসল। গড়িয়ে পড়ল হাসতে হাসতে। তারপর এক মত্ত মুহূর্তে চিবুকে হাত বোলাতে বোলাতে ব্রিজ বলল করুণ করে।

—পেয়ার, তুমি যদি একটু সাহায্য কর আমাদের রোজগার বাড়ে। অথচ তোমার কোন বিপদ নেই। তুমি তো গান ফিরি করনেওয়ালা,—ব'লে হি হি করে হাসল আরেকবার!

চোখ ঢুলু ঢুলু করলেও পদ্মিনীর জ্ঞান হারায় না সহজে।

হয়ত সহানুভূতিও একটুখানি সঞ্চারিত হয়ে থাকবে মনের মধ্যে। জিজ্ঞাসা করল,—বল, কি সাহায্য।

—পুলিশ আজকাল বড় তাড়া করছে। কে জানে আস্তানাটাই সরাতে হয় কিনা।

কান খাড়া করে ধরল পদ্মিনী। হয়ত সব শুনে সহানুভূতির ভাগ কিছুটা বেড়েই থাকবে। যতই হোক পেয়ার তো! তলিয়ে ভাবল না কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে কবুল হল সে। বলল,—ঐ একটা ছাড়া, তোমার জন্য কোন জাহান্নমে যেতে হবে বল!

ব্যস! তার পরদিন থেকেই সুরু হয়ে গেল—গান ফিরির সঙ্গে নতুন কাজ। ব্রিজকে শিকারের সন্ধান দেয়ার জন্য তাকে যে বাড়তি পরিশ্রম করতে হবে এমনও নয়।

রাস্তা চলার সঙ্গে সঙ্গে চোখ ঘুরবে শুধু। শ্রোতাদের কাছ থেকে পয়সা নেবার সঙ্গে চোখ ঘুরবে শুধু! সুন্দরী মেয়ে, দামী গহনা পরা মেয়ে, শিকারের মত শাঁসালো বলে মনে হওয়া মেয়ের সন্ধানে চোখ ঘুরবে শুধু।

রাস্তায়, হোটেলে, কলেজের বাইরে, সিনেমা দর্শকদের ভিড়ে, শ্রোতাদের আসরে চোখ ঘুরবে শুধু। কারও কারও সঙ্গে আলাপ করতেও হতো দরকার মত। তবে তেমন শিকার সে বেশির ভাগ চেপেই যেত বাড়তি পরিশ্রমের ভয়ে।

তুখোড় খেলোয়াড় ব্রিজ। মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমানোর অদ্ভুত কৌশল জানত। কারও সঙ্গে করত প্রেম দিনের পর দিন। কারও সঙ্গে বা প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে ইলোপ। তারপর কিছুদিনের মত উধাও হয়ে থাকত পদ্মিনীর এই মনের মানুষটি।

আবার একদিন আবির্ভাব ঘটত তার—মেয়েটিকে কোথাও উধাও করে দিয়ে। মনে হত যেন ভোজবাজী।

আবার কখনও ধনী মেয়েকে ঠকাত। অলঙ্কার মোড়া মেয়ের সঙ্গে ভাব জমিয়ে কৌশলে অপহরণ করত তার সর্বস্ব।

নসীবের লেখা। নইলে কলুর বলদের মত চোখে ঠুলি বেঁধে ছ'মাসেরও বেশি ব্রিজের এই ভগ্নদূতগিরি সে করল কি করে? আর এই ছ'মাস বখ্‌রার নির্দিষ্ট ভাগ পাদ্মিনীর হাতে তুলে দিতে ব্রিজ বিন্দুমাত্র ভুল করেনি।

প্রত্যক্ষ কোন অপরাধের মধ্যে সে নেই। শুধু খবরটা দিয়ে খালাস! নেশার পয়সার টান পড়ছে না। তাছাড়া ভাল শিকার ঘায়েল হবার পর নির্দিষ্ট হোটেলে ব্রিজ আর তার সাকরেদের সঙ্গে মিলে প্রাণভরে খানাপিনা ও আনন্দ করার সুযোগ।

ক্রমে ক্রমে ব্রিজের দল, তার চেলাচামুণ্ডা, তার বহু বিস্তৃত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বিশদ পরিচয়। সে এখন হলফ করে বলতে পারে, এইভাবে ছাড়া কিছুতেই তা সম্ভব হ'ত না।

সম্ভবতঃ এ সবের একটা মোহ আছে। প্রথম প্রথম তাই কোন কিছু তলিয়ে ভাববার বা মাথা ঘামানোর চেষ্টাই আসত না তার। বাড়াবাড়ি কোন ঘটনা ঘটলে এক একদিন নিজের আস্তানায় ফিরে এসে স্থির মস্তিষ্কে ভাববার চেষ্টা করত অবশ্য। কিন্তু সে ঐ পর্যন্তই। পরদিন আবার সব ভুলে যেত।

হায়রে! এই সময় নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত আর ব্রিজের ব্যাপারে উদাসীন থাকবার ঝোঁকটাও তাকে যেন পেয়ে বসেছিল!

ইতিমধ্যে কয়েকবার আস্তানাটা পাল্‌টাতে হল ব্রিজলালকে। সঙ্গে পদ্মিনীও।

সাজানো ফ্ল্যাটে বাস করতে অভ্যস্ততা এসে গিয়েছিল। প্রথম প্রথম তাই এই সব খোলার ঘরে কষ্টই হ'ত। ভগবান অভ্যাসটা ভেঙ্গে দিয়ে হয়ত অলক্ষ্যে তার উপকারই করেছিলেন সেদিন।

দিন দিন অপরাধের সংখ্যা বাড়তে লাগল। আর ক্রমশঃ একটা চিন্তা যেন তাকে পেয়ে বসতে লাগল। খপ্পরে পড়া শিকারগুলির পরিণতির কথা চিন্তা করে—কেমন একটা অস্বস্তি কেমন একটা কষ্ট বোধ সুরু হল শেষে।

যেদিন ঘটনা পরম্পরায় তলিয়ে ভাববার পালা এলো—সেদিন ছ'মাসের সমস্ত পাপ একসঙ্গে মূর্তি পরিগ্রহ করে তার গায়ের মাংস যেন খুব্‌লে খুব্‌লে খাওয়া সুরু করল।

তাহলে যে পরিণতির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ব্রিজের সঙ্গে লড়াই করেছে পদ্মিনী—সেই পদ্মিনী নিজেই—আপন ইচ্ছায়—আর কতকগুলি দুর্ভাগীকে সেই পরিণতিতেই পৌঁছে দেবার কাজে ব্রিজের সাহায্য করছে!

এভাবে তলিয়ে কেন যে সে ভেবে দেখেনি এতকাল ভাল করে তারই কি হদিশ রাখে সে! আর কেনই বা এতদিন পর তার বিবেকে এই ধাক্কাটা এসে পৌঁছল—সেটাই কি স্পষ্ট তার কাছে!

পার্কের নিরালা কোণে সন্ধ্যার আবছায়ায়—সেই অলঙ্কার মোড়া মেয়েটার দুর্দশা চোখে দেখার পর থেকে কি? তার চোখের উপর ব্রিজের হাতে কেমন আধমরা হল মেয়েটা! একটা বিদ্রোহ সঙ্গে সঙ্গে ঘুলিয়ে উঠতে থাকল তার অন্তরের মধ্যে—এরপর বললে বিশ্বাস যাবে কেউ?

সেই প্রথম নাড়া। বুঝল তার একটা বিবেক আছে। এবং সে যে ভগ্নদূতের কাজ করছে—তা ততটা নির্দোষ জিনিস নয়। সেইদিন থেকেই—হ্যাঁ, সেইদিন থেকেই—আবার সেই বাঙ্গালী মেয়েটার চোখও হন্যে করে মারতে লাগল তাকে।

এ যাবৎ কোন শিকারের পরিণতির সঙ্গেই তার প্রত্যক্ষ বা চাক্ষুষ সম্পর্ক ছিল না বলেই বোধহয় বিবেকে কোন খট্‌কা লাগেনি এমন করে। সে ভগ্নদূতিয়ালী করেছে—এমন শিকারের সঙ্গে সেই পার্কেই প্রথম সাক্ষাৎ।

সেদিনই সে বলল ব্রিজকে—এত নিষ্ঠুর তুমি ব্রিজ!

ব্রিজও জবাব দিল—তুমিই কি কম নিষ্ঠুর পেয়ার! তুমি খোঁজ না দিলে—নিষ্ঠুর হবার সুযোগ পেতাম কি করে বল। আর ওসব ফাল্‌তু ভাবনা নিয়ে মাথা খারাপ করোনা তো। রাখো রাখো।

সেই ঘাড় টান করে দাঁড়ানো আবার পদ্মিনীর। আর সেই গজ্‌গজ্‌ করতে থাকা।—না ফালতু ভাবনা নিয়ে মন খারাপ করবে না।

—তাহলে তোমার তো সেই লাইনই ভাল ছিল, পেয়ার। এ লাইনটাতে মনকে আর একটু কঠিন করতে হয় বুঝলে।—

চিবুকে মোলায়েম করে হাত দিয়ে সোহাগ জানালো ব্রিজ। একটা জ্বালা ঝাঁ করে হঠাৎ ঐ হাতের সঙ্গে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল যেন। সরে গিয়ে উদ্ধতভাবে সে তাকালো ব্রিজের দিকে।

ব্রিজ যে সুকৌশলে ইচ্ছাকৃত ভাবেই তাকে একাজের মধ্যে এনেছে—সেটা হয়ত অল্প অল্প মাথায় ঢুকছিল তখন। হঠাৎ অদ্ভুত শব্দ করে উঠল মুখের মধ্যে।

—থুঃ থুঃ থুঃ

—কি হল পেয়ার। মাথা বেগড়াল নাকি আবার।—এগিয়ে কাছে এল ব্রিজ।

—হট্ যাও! তোমায় দেখলে আমার পিত্তিনাড়ী জ্বলে যায়।—

হো হো করে উচ্চকিত হাসিতে ঘর ভরে তুলল ব্রিজ।

—সত্যিকারের মহব্বতের লক্ষণ, পেয়ার। সরাবের মলম লাগিয়ে দাও। দেখবে কেমন ঠাণ্ডা বনে গেছে।

—থুঃ থুঃ থুঃ—

মুখের মধ্যে আবার নিষ্ঠিবন ত্যাগ করার শব্দ করে উঠল পদ্মিনী। তারপর খানিকটা সংহত করল নিজেকে। বলল—আমি তোমার ঐ সি-আই-ডি গিরির মধ্যে আর নেই। ব্যস্।

ব্রিজ তাকিয়ে দেখল। আবার সেই ঘোলাটে দৃষ্টি ওর চোখে। কাজেই তখনকার মত কথা বাড়াল না আর।

হয়ত অপরাধের প্রত্যক্ষতার সীমার বাইরে ব্রিজ তাকে ইচ্ছা করেই রাখত। কারণ সে বুঝতে পারত, দয়া মায়া এইসব বোকা প্রবৃত্তিগুলি মেয়েটার সহজে ধ্বংস হবার নয়। মাঝে মাঝে বিগড়াত সে। তখনি সোহাগের ডোজ্‌ বাড়িয়ে দিতেই ঠাণ্ডা মেরে যেত বোকা মেয়েটা।

বোকা মেয়েটাকে চালাক করবার কিছুটা ইচ্ছাই হয়ত শেষের দিকে ব্রিজলালকে ভর করে থাকবে। তাই সইয়ে সইয়ে অপরাধের প্রত্যক্ষতার আওতায় তাকে টেনে নামানোর চেষ্টার হল সূত্রপাত। পার্কের দৃশ্য তারই অবতারণা।

কিন্তু পার্কের দৃশ্যের ধাক্কাটা উল্টে পাদ্মনীকে এমন মর্মাহত করল, যে সেদিন থেকে একটা দুরন্ত মানসিক অস্থিরতা হয়ে উঠল তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। তার কাছে দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে উঠল। এসব অপরাধের ছোঁয়া থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে গেলে আসলে ব্রিজের থেকে সরে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

ব্রিজের উপর তার মোহ যে পূর্বের মত আছে এমনও নয়। তবু ব্রিজ যে তার অভ্যাসের সঙ্গে অনেকখানিই জড়িয়ে গেছে—সেটাও তো অস্বীকার করবার নয়।

বোকা মেয়েকে ঝানু করবার ইচ্ছা থেকেই হোক—অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্য থেকেই হোক—পার্কের ঘটনার অল্পদিনের মধ্যে—ব্রিজ এমন আর একটা ঘটনার অবতারণা করল—যা পদ্মিনীর মানসিক অস্থিরতাকে ডুবিয়ে—স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতে সাহায্য করল।

ব্রিজ ভাবেনি হয়ত মচ্‌কাতে গিয়ে ডাল ভেঙ্গে যেতে পারে। তারই হিসাবের ভুল। শেষ ভয়টুকু ছুঁড়ে ফেলে দিল পদ্মিনী শেষবারের মত।

শোভা যে তারই খবর দেওয়া শিকার—দেখেই বুঝেছিল পদ্মিনী।

ব্রিজলাল কি ভেবে সরাসরি ওদের ঘরে এনেই হাজির করল শোভাকে। তারপর সেই পুরানো প্রক্রিয়া। পদ্মিনীকে বোন বলে পরিচয়। এবং বেশ কিছুদিন যাবৎ প্রেমের অভিনয়। হায় তখনও যদি সামান্য একটু মুখের কথা খরচ করত পদ্মিনী!

ব্রিজের ব্যবসার প্রধান আড্ডার সঙ্গে কোন যোগাযোগই তার ছিলনা। ব্রিজও গোপন রাখত।

শোভাকে যেদিন আড্ডা থেকে ঘুরিয়ে আনা হল—শোভা কিছুই খেল না। একটা কথা বলল না কারো সঙ্গে।

দ্বিতীয় দিনে আবার যাবার পালা। ব্রিজের তখন একেবারে অন্য চেহারা। ও লাইনটা ছিল শোভার চরিত্রের সম্পূর্ণ বিরোধী। সে পা জড়িয়ে ধরল ব্রিজের। পরে পদ্মিনীর।

পদ্মিনী সেদিনও একটাও কথা না বলে বেরিয়ে গিয়ে সমস্যা এড়াল। ফিরল অনেক রাত্রে। এসেই বুঝল শুধু যে গোয়ালেই যেতে হয়েছে মেয়েটিকে তাই নয়। সমস্ত শরীরে তার মারের দাগ।

"আবার এলো পরদিন। তারপর থেকে শোভাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে শুধু কাঁদত। হতভম্ব চোখে কখনও বা তাকাত। নিজের ভাগ্যের সুতো যে নিজের ভুলে কোন্ লাটাইয়ে জড়িয়েছে বোধহয় সাংঘাতিক মূল্য দেবার পরই বুঝতে পেরেছিল শোভা।

এই বোকা মেয়েটিই শেষ পর্যন্ত সবাইকে অবাক করে দিল এক দুঃসাহসী কাণ্ড করে।

বেশিদিন তাকে গোয়ালে যেতে হয়নি। হঠাৎ সে আত্মহত্যা করে বসল গলায় দড়ি দিয়ে। তাদেরই ঘরে।

পদ্মিনী যখন বাড়ী ফিরল—ব্রিজ তখন নিঃশব্দে নামিয়েছে লাশটা। বীভৎস দৃশ্য। ব্রিজ ভয়ে ভয়ে বিব্রত চোখে তাকাচ্ছিল পদ্মিনীর দিকে। হয়ত ভেবেছিল কি কাণ্ডই না জানি করে বসবে পদ্মিনী। তাই সন্ধ্যার অন্ধকারে—লাশ সরানোর ব্যবস্থা করল সম্পূর্ণ নিঃশব্দে।

কিন্তু পদ্মিনীর চোখ শেষবারের মত খুলে গেল। সে লক্ষ্য করছিল—ব্রিজের চোখে দুর্বলতা। চুরি করে সে তাকাচ্ছে বারংবার। শোভা প্রাণ দিয়ে পদ্মিনীর প্রাণের অস্থিরতার অবসান করে দিয়ে গেল।

পরদিন সে একবস্ত্রে হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে সেই যে গান ফিরিতে বেরুল আর ফিরল না এ বাড়িতে।

কিন্তু ব্রিজের হাত থেকে রেহাই পাওয়া অত সহজ নয়। কখনও রেল ষ্টেশনে, কখনও ভাঙ্গা দালানের নীচে, রাত কাটাতে হতো তাকে এই সময়।

যতদিন বম্বে ছিল ততদিন ব্রিজের লোকেরা রেহাই দেয় নি পদ্মিনীকে।

সে রাত্রে একটা ঝুলবারান্দার নীচে খোলা ফুটপাথের উপর এক দল ভিখিরীর সঙ্গে রাতকাটানোর আস্তানা। ভাব জমিয়ে বিকেল থেকে জুটে পড়েছিল ওদের সঙ্গে।

ভাগ্যিস আগেই নজরে পড়েছিল তার। ব্রিজেরই একজন ইয়ারের মুখ এ জায়গায় এত রাত্রে নিশ্চয়ই অপ্রত্যাশিত!

ওরা তখন হন্যে হয়ে ঘুরছে তার পিছনে। ও নিঃশব্দে বুকে হাঁটতে সুরু করল একটু একটু করে। ঢুকে পড়ল পাশের গলির মধ্যে।

ব্রিজের ইয়ারের চোখ তাবলে এড়াতে পারে নি সে। সেও গলিতে ঢুকে পড়ছে দেখে পরিত্রাহি ছুটতে লাগল পদ্মিনী।

গভীর রাত্রে গুলির শব্দ উঠল। নিঃস্তরঙ্গ গলির জানালাগুলো খুলে যেতে লাগল চট্‌পট্‌। পাড়া সরগরম হয়ে উঠছে দেখে পালিয়ে গেল লোকটা।

অল্পের জন্যই সে বেঁচে গিয়েছিল বলতে হবে। হাতের বাহুতে আলতো করে ছুঁয়ে শিস্‌ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল গুলিটা।

সেও অবশ্য দাঁড়ায়নি আর। এগলি সেগলি করে সে রাত্রের মত আত্মরক্ষা করল। হয়ত সঙ্কল্পে অটল ছিল বলেই ভগবান তাকে রক্ষা করেছিলেন।

হারমোনিয়ামটা ফেলে এসেছিল বলে আবার ফিরে যেতেও হয়েছিল সেদিন সকালেই—বুকে অসম সাহস বেঁধে। হারমোনিয়াম ছাড়া সে যে কানা।

ভিখিরী বুড়ো আসলে সৎ মানুষ। বুকে করে আগলে রেখেছিল হারমোনিয়ামখানা। বুড়োর হাজা ভর্তি পায়ে মাথা ঠেকিয়েছিল পদ্মিনী।

হারমোনিয়ামটা সংগ্রহ করে—সে দিনকতকের জন্য ব্রিজদের দৃষ্টির বাইরে চলে যাবার উদ্দেশ্যে বম্বে ত্যাগ করে পুনায় চলে এলো। নিজের উপর বিশ্বাস এতে যথেষ্ট দৃঢ় হলো তার। কিন্তু এভাবেই বা কতদিন বাঁচা চলে।

নিজের গান গাইবার ক্ষমতার উপর তার যথেষ্ট আস্থা।

ভিখিরীদের আখ্ড়ায় আখ্ড়ায় ঘুরতে ঘুরতে—ইতিমধ্যে দু'টি ভক্ত সঙ্গী জুটেছিল তার। একজনের নাম পিটার। সে নিজের পরিচয় দিত খৃষ্টান বলে। আর কুন্তী ছিল তার জুটি। ওরা দুজনেই দিদি বলে ডাকত তাকে।

পুনায় ওরা দু'জন সঙ্গী হল তার। পুনায় গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় একটা বুদ্ধি গজাল। তার মা ছিলেন রামায়ণের দলের মেয়ে। সেই বা কেন একটা ছোট খাট দল করবে না।

পিটার আর কুন্তী তো শুনে খুব খুসী। একটু আধটু তালিম দিয়ে সে সুরু করল একটা ছোট্ট দল। যার অধিকারী সে নিজেই।

রামায়ণের গান তার জানা নেই। তাই অনেক ভেবেচিন্তে সে মুখে মুখে রচনা করে ফেলল এক দুঃখী লড়্কীর গান। যার মা তাকে ত্যাগ করেছে। বাপের হদিস কেউ জানে না। ভাগ্য দোষে নিজের সন্তানকে যার পরিত্যাগ করতে হয়েছে। চুরি, জোচ্চুরি করতে হয়নি এমন পাপ নেই। অবশেষে ভিক্ষা হল সম্বল।

একটু আধটু তালিম দেওয়ায় পিটাররা দোহারগিরি করত প্রথম প্রথম ভালই। শেষে কিছুতেই জমছে না দেখে পিটার প্রস্তাব করল,—বুঝলে দিদি দোহারগিরি বাদ যাক। আমরা দুজনে বরং নাচব তার বদলে। দেখবে কি রকম জমে যায় আমাদের দল।

পদ্মিনীর মাথা খাটিয়ে বার করা গানের সঙ্গে সম্মিলিত হলো পিটারদের মাথা খাটিয়ে বার করা নাচ। দুইয়ে মিলে চেহারাটা যে ঠিক কেমন দাঁড়াল, ওরা নিজেরা বুঝতে পারত না ভাল। তবে পুনায় এত করেও রোজগার তেমন বাড়লো না দেখে ওরা তিনজনেই শেষ পর্যন্ত আবার বম্বে ফিরে এল।

একটা রেলপুলের তলায় মনের মত একটা আস্তানাও জুটে গেল এবার। সারা দিন ঘোরে আর রাত্রে ইটের উনুনে হাড়ি চাপায়। এখন এক পরিবারেরই তিনজন মানুষ ওরা।

শরীরের নাম মহাশয়—সে ভেবে দেখল। নইলে মদের নেশা—যে মানুষের মজ্জাগত হয়ে উঠেছিল প্রায়—এই সময়ে ক'দিন সে নেশা করতে পেত!

অনেকদিন পর সেদিন পাওয়া গেল একটু নিশ্চিন্ত সুযোগ। অনেক দিনের পর বলেই বোধহয় শরীর দেমাক দুইই বেতালা করছিল। পুলের তলায় ঘরের মত গুম্‌টীর সামনে বসে বসে ঝিমালো সারাসন্ধ্যা। পিটার আর কুন্তীও নেশা করেছিল।

পুলের তলায় বেওয়ারিশ বাস করা চলছে বেশ কিছুদিন হল। তাই এরকম সম্ভাবনার কথা মনেও আসেনি। হঠাৎ এক সিপাহী কোথা থেকে উদয় হয়ে লাঠি নিয়ে করল তাড়া। সিঁড়ি ভেঙ্গে নেমে এল নীচে পর্যন্ত।

একমাত্র পালানোর উপায় পুলের নীচেকার রেল লাইনের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়া। কিন্তু তাহলে তো আর আস্ত থাকবে না কেউ। অবশেষে বে-আইনী ভাবে পাব্লিক জায়গায় বাস করবার জন্য গ্রেপ্তার হওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

হাজতে পুরবার পর কি ঘটবে ভেবে—পদ্মিনী ভীষণ আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ল! অগত্যা সিপাহীজীর পাগড়ীর ছায়ার নীচে গোল গোল নজরের দিকে লক্ষ্য করতে চেষ্টা করলো প্রাণপণে।

মলিন ঘাঘ্‌রা পরলেও কুন্তীর বয়সটা উড়িয়ে দেবার নয়।

সিপাহীজীর বাঁহাতের চেটোর মধ্যে তখন সেই কুন্তীরই ঘাড় বার করা চুলের অগ্রভাগ। আর মুখে রসিকতা।

—ইস্! একদম মেমসাব্ বনে গেছ বাবা। তা মেমসা'ব্! এ ভাগাড়ে কেন। কম্‌সে কম একটা কুঠি তো বানিয়ে লে।

কুন্তী সুন্দরী নয়। কিন্তু যৌবনে তো কুক্কুটীও ধন্য। তার উপর সে সেয়ানাও যথেষ্ট।

—উঃ লাগছে, লাগছে সা'ব্, লাগছে বড়।—চোখ দুটো আর শরীরের কত ভঙ্গীই না জানে অতটুকু মেয়েটা!

চুল থেকে সা'বের হাত কিছুটা শিথিল হতে, 'সাব্' বলে এমন একটা অনুনয়ের সুর আনল গলায় যে তাক্ লেগে গেল পদ্মিনীর।

—এই তো আমার কুঠি সা'ব্।

—এই তোমার কুঠি? আচ্ছা। তবে তো থোড়া মেহেরবাণী করতে হয় মেমসা'ব্। কুঠির মায়া ছেড়ে থানায় যেতে হবে থোড়া।

অন্য বেওয়ারিশ বাসিন্দারা কে কি করছে খেয়াল নেই সিপাহীজীর। কুন্তীর সঙ্গে রসিকতায় এতই মশগুল তখন। কাঁপতে কাঁপতেও বোধহয় তাই মাথায় মতলব খেলানোর ভরসা পেল পদ্মিনী।

আর ভাগ্যিস পিটার ছিল না এই সময়টা। মরদ দেখলে নিশ্চয়ই শরীরে দয়ার ভাগ কমে যেত সিপাহীজীর।

সিপাহীজীকে পদ্মিনী এতক্ষণে কুর্নিশ করল বুক বেঁধে।

—আমরা বহুত গরীব আছি সাব্।

বারংবার সা'ব্ ডাকে লেজ কিছুটা হয়ত ফুলে গিয়ে থাকবে সিপাহীজীর।

পুলের তলার গুম্‌টীর মত যায়গাটায় খড় বিছানো শয্যা। একটু দূরে রান্নার জন্য ইট বসানো। এধারে বসবার জন্য কতকগুলো ইট সাজিয়ে উঁচু করা। তার উপর একটা ছেঁড়া চট পাতা।

ফুঁ দিয়ে জায়গাটা ঝেড়ে দিল পদ্মিনী। তারপর বলল,—মেহেরবাণী করে বসুন।

সা'ব্ গোফে মোচড় দিয়ে একটু ইতস্ততঃ ক'রে বসেই পড়ল শেষটা। অনেকদিন পরে নেশার ঘোরে বেতালা ভাবটা ততক্ষণে বেশ বেড়েই গিয়েছিল পদ্মিনীর।

কিন্তু বিপদে পড়লে নিশ্চয়ই নেশা ছুটে যায়। নইলে অমন নিপুণ হাতে মতলব হাসিল করতে পেরেছিল কি করে;

হাজত থেকে বাঁচতে গিয়ে—সেদিন যে মতলবের আশ্রয় নিতে হয়েছিল তাকে—স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে তা সে কিছুতেই পারত না। যত জাহান্নমেরই না সে মেয়ে হোক! কেউ কি বিশ্বাস করবে সে কথা!

আর জাহান্নমের অভিজ্ঞতা আছে বলেই—কুন্তীকে সেদিন যে পাপ করতে সহায়তা করেছিল—তার মর্মজ্বালা জীবনেও ঘুচবে না বোধ হয়।

কুন্তীকে একপাশে টেনে নিয়ে বোঝাতে সে রাজীও হয়ে গেল অবাকভাবে। আর সা'বও। ওরা যতক্ষণ গুমটি থেকে না বেরুল ও ঠায় সেই ইটের ঢিপিটার উপর বসে বসে যেন পাহাবাদারীই করলো ঢুলতে ঢুলতে।

আর এযাবৎ কোনদিন যে চিন্তাটা গুরুত্ব পায়নি তেমন—অবাক কাণ্ড—সেই চিন্তাটা বারংবার মগজকে দীর্ণ করে তুলল। না জানি রামালুর মেয়েটা কতবড় হয়েছে এতদিনে!

বারংবার রামালুর মেয়ের ভুলে ভুলে আসা আঁদল মনে করতে চেষ্টা করল। আর বারংবার কুন্তীর আঁদলের সাথে তার মেয়ের আঁদল কেমন যেন একাকার হয়ে যেতে লাগল।

হঠাৎ গা'টা শিরশিরিয়ে উঠল। অধিক রাত্রের হেমন্তের ঠাণ্ডা ঝাপ্টায় বোধ হয়। নাকি কুন্তীর খুন্সুড়ীতে।

সাহেবকে বলছে তখন কুন্তী—মেমসা'বের এ কুঠিতো সা'ব আসবে বলেই। আসবেতো মাঝে মাঝে—সা'ব?—

তুখোড় মেয়ে বটে কুন্তী।

সা'ব্ বিদায় নেবার আগে ঠোনা মারল কুন্তীর গালে। আর বলল,—এ ছুক্‌রি বহুৎ দুষ্টু আছে।

সিপাহীজী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট শিশুর মত বেটী নাচতে সুরু করল প্রায়।—হাজত রেহাই, দিদি, হাজত রেহাই।

পদ্মিনী মুখ গোমড়া করে বলল—রেহাই না ছাই। আমি না থাকলে নিশ্চয়ই তুই হাজতে যেতিস।

—তুমি কচু জান দিদি। আমি এ রাস্তায় তোমার চাইতে বেশি দিন আছি।

মুখে বলল,—ও তাই বুঝি?

কিন্তু ভগবান জানেন এ জবাবও পাদ্মনীর মনের অস্বস্তিকে আড়াল করতে পারেনি।

পরদিন সে গানে বেরোলনা। সারাদিন মুখ গোমড়া করে বসে রইল দেখে পিটার জিজ্ঞাসা করল,—কি হয়েছে তোমার বলতো দিদি—

অনেক পীড়াপীড়ির পর শুধু পিটারকে এড়ানোর জন্যই মুখ খুলল পদ্মিনী। বলল,—পাপী লোকের ওরকম হয়রে মাঝে মাঝে—ওরকম হয়।

সেকথা পিটার তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল মূহূর্তের মধ্যে।

বল্ল,—বেশ তো চল, তোমাকে আমাদের প্রিষ্টের কাছে নিয়ে যাই। পাপ করলে কনফেশান করবে—ব্যাস চুকে বুকে গেল।

পিটার মাঝে মাঝে অন্যায় কাজ করে নাকি যেত প্রিষ্টের কাছে। তারপর হাল্কা হয়েই ফিরে আসতে দেখেছে পদ্মিনী। সত্যি যদি সে খৃষ্টান হত পিটারের মত। তাহলে হয়ত প্রিষ্টের কাছে কনফেশান দিয়ে সেদিনই হাল্কা হয়ে যেতে পারত—ওর মত।

॥ সাত ॥

খ্রীষ্টান, হিন্দু, মুসলমান বা অন্য কোন ধর্মের সঙ্গেই তার নিজস্ব বিশ্বাসের কোন সম্পর্ক আছে কিনা—তা সে জানে না।

শুধু জানে তার বিশ্বাসটা একটু অন্য ধরণের। কেমন করে যে সে নিজের মনের মধ্যে বিশ্বাসটা গড়ে তুলেছিল তার হিসাবও তার আয়ত্তের মধ্যে নয়।

শুধু সে অনুভব করত, অন্তরের মধ্যে একটা হিসাব কিছুদিন যাবৎ বারংবার যেন জাগ্রত হয়ে উঠতে চাইছে।

শেষে অনুভূতিটা বিশ্বাস হয়ে তাকে চেপে বসল। পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যদি নরক থাকে, তা এখানে। এবং তার অন্তর থেকে পাওয়া এই বিশ্বাস মিথ্যা নয়। কিছুতেই মিথ্যা নয়। পদ্মিনীর জীবনের পরবর্তী ঘটনাবলী সেটাই প্রমাণ করেছে বারংবার।

কুন্তীর হাজত-রেহাই ঘটনার থেকেই বোধহয় এর সূত্রপাত। থেকে থেকে সেই যে রামালুর মেয়ের কথাটা অহেতুক আবেগ সৃষ্টি করতে সুরু করল সহজে আর রেহাই পায়নি তা থেকে। একটা উন্মনা ভাব হামেশাই তাকে এমন গ্রাস করত—যে কোন কাজেই মন বসাতে পারত না আর তেমন করে।

আর সঙ্গে সেই চাপা ভয়ের ছাপ ছিল অষ্টপ্রহরের সাথী। হে ভগবান—ব্রিজের দলের চোখে যেন না পড়ে যায় আবার। সব মিলিয়ে বম্বেতে পুনার মত আর দুঃখী লড়কীর গান জমিয়ে বসতে পারল না কিছুতেই।

একে তিনজনের পেট চলার মত রোজগার নেই। তদুপরি—সময় নেই অসময় নেই রামালুর মেয়ের সেই নিত্য নৈমিত্তিক কুরে কুরে তাকে খাওয়া। সত্যি সত্যি সে উদভ্রান্ত হয়ে যাবার জোগাড়।

কুন্তী একদিন জিজ্ঞাসা করল—কি হয়েছে তোমার দিদি।

স্বল্পভাষী পদ্মিনী সেদিন এমন বাচাল হয়ে উঠল সহসা যে কুন্তী তো অবাক। বলল,—তোর উপর হিংসে।

কুন্তী একটা অন্য মানে বুঝল। তাই জবাবটাও হল সেই রকম।

—কেন, পিটার তোমার ভাই তো।

—তার জন্য নাকিরে মুখ্যু।—এত দুঃখেও হাসি পেল পদ্মিনীর।

—তবে ?

—তোর সাহেবের জন্য হিংসে !

চোখ কপালে তুলল কুন্তী—সা'ব্ ? ওঃ হো মনে পড়েছে। সা'ব্ না ছাই ! মাথা মোটা বুদ্ধু কাঁহাকা।—হি হি করে উজবুকের মত হেসেই বাঁচেনা মেয়েটা ! পাদ্মনী এবার গম্ভীর হয়ে যেতে চেষ্টা করল বটে। কিন্তু কথা বলবার ঝোঁক তাকে এখন পেয়ে বসেছিল !

—বুদ্ধুই হোক আর বুড়বাকই হোক একটা যা হোক ভদ্দর লোক সা'ব্ তো আছে তোর।

—ফির আসবে তো তুমি নিয়ে নাও না ?

—দুর পাগলী কাঁহাকা ! আমি তো" বুড়ী। ছুঁড়ি ছাড়া বুড়ী কি আর সা'বদের চোখে ধরেরে।

কুন্তী এসে আচমকা ওকে ঝাপটে ধরল—ইস্, দিল্লাগী করছ তুমি ; তাই না দিদি ? তুমি যে কেমন ব'নে গেছ ক'দিন থেকে কিছু বুঝি না।

কানেই তুলতে চায় না সে কুন্তীর কথা। বলল—দেখ কুন্তী, আমারও সা'ব্ আছে একটা। ক'দিন থেকেই কেবল বাঁ চোখটা নাচছে। আর তাকে দেখব দেখব করে মনটা কেমন হয়ে যাচ্ছে। একটা মন বলছে যাই দেখে আসি। আর একটা মন বলছে খবরদার। তুই কি বলিস ?

—ইস্। তবে তুমি রাস্তায় আসবে কেন মরতে ?

—আর তুই ?

—আমি তো ছোটবেলা থেকে।

—আমিও তো।

—তবে যে বলছিলে সা'ব্ আছে তোমার।

—তোরও তো আছে।

—থুঃ অমনি সা'ব!

—অমনি সা'বের জন্য বুঝি মন খারাপ হতে নেই।

—মাথা খারাপ! তবে তো সাদি করেই লেবে।

—আমার মাথাই খারাপ হয়েছে রে কুন্তী! আমি অমনি সা'বকেই দেখতে যাব আজ। ফিরতে যদি দু'দিন দেরী হয়—ভাবিস না কিছু।

—সত্যিই যাচ্ছ দিদি।—অবাক চোখে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল কুন্তী দিদির ফোলা ফোলা রুক্ষ মুখখানার দিকে। শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি চলে যেতে দেখে ভয়ে ভয়ে আবার জিজ্ঞাসা করল—ফিরবে তো দিদি!

—দুঃখী লড়্কীর গান রয়েছে না? ডেরাটা তা'বলে ছাড়িস না কিন্তু।

পদ্মিনীর ব্যবহার অনুধাবন করতে কুন্তী হিমসিমই খেল মিছিমিছি। কে জানে কুন্তীর সঙ্গে দিল্লাগী করার সময় পদ্মিনী নিজের অজ্ঞাতসারে রামালুর ইঙ্গিতই করেছিল কিনা।

কিন্তু এ জ্ঞান তার দিনের আলোর মত পরিষ্কার আজও— সেদিনকার মত উদ্দেশ্যহীনভাবে এর আগে কখনও পথে নামেনি সে। কিম্বা এমন উদভ্রান্তিও তাকে গ্রাস করেনি।

হয়ত কোন তৃতীয় শক্তিই তাকে দিয়ে সেদিন পথ চলিয়ে নিচ্ছিল নইলে যে সে রামালু ও মেয়ের আসন মন থেকে বিনা দ্বিধায় এতদিন সরিয়ে রাখতে পেরেছিল। ভুলেও কোন আকর্ষণ বোধ করেনি এ কয় বছর। উদ্ভ্রান্তের মত তারই পুরানো ডেরার সামনে এসে হাজির হতে যাবে কেন!

পুরানো ডেরার সম্মুখীন হতেই পুরানো তারে ঘা পড়ল বোধহয়। একসঙ্গে এতগুলো আবেগ কিলবিল করে ঘুলিয়ে উঠল—যে মাথা ঠিক রাখাই দায়। এই সব আবেগের বস্তুগুলি—কোথায় যে ঘাপটি মেরে থাকে। অথচ রামালু আর তার মেয়েকে তো সে আখেরের কোন দাবী না রেখেই পরিত্যাগ করেছিল।

বহুক্ষণ ইতস্ততঃ করার পর যখন সন্ধান জানতে পারল—রামালু আর তার মেয়ে দু'দিন আগেও সেই পুরানো ডেরা আঁকড়েই ছিল। আবেগগুলো তখন দলা পাকিয়ে বুক থেকে উঠে গলা আটকে ধরবার উপক্রম করল।

ঠিক তারপরই এম্বুলেন্সে হাসপাতালে পাচার হবার সংবাদও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে কর্ণগোচর হল। তখন দলাটা হঠাৎ কণ্ঠনালী চেপে ধরল এমন জোরে—যে শ্বাস বন্ধ হবার জোগাড়।

তাহলে এই জন্যই, এই জন্যই মনটা তার এমন কুডাক ডাকছিল! নাড়ীর টান তাহলে কি একেই বলে! তখন রামালুর চাইতেও তার মেয়েটার জন্যই অসম্ভব আর্তি তাকে পেয়ে বসেছে।

উন্মাদের মত সে আতিপাতি করে বার করল সন্ধান। কিন্তু এরকম সন্ধান বার করার চাইতে না করাই ছিল ঢের ভাল!

রামালু আর তার মেয়ে দু'জনকেই ধরেছিল কাল বিসূচিকায়। হাসপাতালে আনার পর রামালু পাঁচ ঘণ্টার বেশি টেঁকেনি। আর বাচ্চা বলেই বুঝি মেয়েটার যুঝবার ক্ষমতা বেশি ছিল। সে শেষ হয়েছে সকালবেলা। ওয়ারিশনের অভাবে রামালুর সৎকার করেছে সমিতির গাড়ী।

আর বাচ্চাটার শব তখনও অপেক্ষায়। সন্দেহ নেই—পদ্মিনী মা হিসাবে আত্মপরিচয় দিয়ে না দাঁড়ালে—তারও সৎকারের ব্যবস্থা হত রামালুরই মত।

হুমড়ী খেয়ে পড়ল পদ্মিনী। যেদিন থেকে ওদের ত্যাগ করেছিল সেদিন থেকেই তো ওরা মৃত—পদ্মিনীর কাছে।

আশ্চর্য—সাদা চাদরটা খুলতে গিয়ে তবু হাত কাঁপল কেন। ছ'মাসের সেই জীবন্ত মুখখানার সঙ্গে, দু'বছরের কি কোন মিল থাকতে নেই—ভগবান! নিষ্প্রাণ ছোট মুখখানার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল বহুক্ষণ।

ভিতরে এক যুগের কান্না ফুলে ফুলে পাক খাচ্ছিল। কিন্তু উপরে তা এমন করে সংযত করে রাখল—বোধহয় পদ্মিনীর মত মায়েদের পক্ষেই তা সম্ভব।

সেই মুহূর্তে সে বিশ্বাস করে, প্রচণ্ডভাবে বিশ্বাস করে—যে জাহান্নমেই তুমি যাও—পেটে যাকে ধরবে, তার হাত থেকে রেহাই নেই। মায়েদের নাড়ীর ভিতর নিশ্চয়ই ভগবান অদ্ভুত কিছু মন্তর দিয়ে দেন। সময় নেই অসময় নেই—এই যে কুডাক ডাকছিল মন! ঠিক সময় সে মন্তর এমনি করেই তবে জ্যান্ত হয়ে ওঠে।

অতীতের সমস্ত অবহেলা বুকের মধ্যে শেল হয়ে উঠল! কোলের উপর ছোঁ মেরে তুলে নিল মেয়ের ছোট্ট শবটা। চেপে ধরল বুকের সঙ্গে। তবু কি নামে শেলটা! সমস্ত সংযম ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে ডুকরে উঠল। কিন্তু সে একবারই। তারপর ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল, মেয়েকে।

চোখের জল শুকিয়ে ফেলল। হাসপাতালের কাছ থেকে সময় চেয়ে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

পেটে দানা নেই তখনও। মগজেও তার ঘিলু আছে কিনা—বলতে পরে না সঠিক। কিন্তু রামালুর মেয়ের ওয়ারিশান সে। এবং ঘাট খরচের একটাও পয়সা হাতে নেই। এই চিন্তাটুকুই শুধু কিলবিল করছে মাথার মধ্যে।

অবিলম্বে পয়সা যোগাড়ের কি যে পন্থা—মাথায় ঢুকছে না তার। কেবল এক গান গেয়ে পয়সা নেওয়া—ব্রিজলালদের মতে যার নাম ভিক্ষা।

যে যা খুসী ভাবুক। অবশেষে একটা মোড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মনে মনে প্রস্তুতও হোল। চেষ্টাও করল গান আনবার। কিন্তু বৃথা। ভিতরটা তার মরুভূমির মত শুক্‌নো। পারল না কিছুতেই। ভিক্ষাকে সে ইজ্জত দেয় না কোনদিন। তবু, তবু—মরিয়া হয়ে শুধু হাতে সেই ভিক্ষাই সুরু করল!

—দুঃখী লড়্‌কীকে থোড়া মদৎ করবেন বাবু। দুঃখী লড়্‌কীকে থোড়া মদৎ করবেন বাবু—এই কথা বক্‌তে বক্‌তে মুখে ফেনা উঠে যাবার জোগাড়।

কতক্ষণ যে ভিক্ষা করেছে খেয়াল নেই। খেয়াল হতে দেখে বিকেল ঢলে পড়েছে। তাড়াতাড়ি গুণতে বসে গেল ভিক্ষার পয়সা। গোণা শেষ হতে দুই হাটুর মধ্যে মুখ চেপে ধরে হঠাৎ ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

পাপীর ছোঁয়া লেগেছিল বলে—রামালুকে যথেষ্ট সাজা দিয়েছো ভগবান! আমার এই দেহ তোমার নামে মানত করছি। মরার পর শেয়াল, কুত্তা, শকুনি দিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খাইয়ে দিয়ো কিম্বা যা খুসী করো!

কিন্তু রামালুর মেয়েটা—সে তো অবুঝ শিশু! এই পাপীর রক্ত আছে বলে—তাকে কেন ক্ষমা করবে না! তার কেন সৎকার হতে দেবে না তুমি?

সে চীৎকার করেছিল কিনা বলতে পারবে না। তবে ভিক্ষার পয়সা গুণে যখন বুঝতে পারল, ঘাট খরচের জন্য নিদেন পক্ষে দশটি টাকা তখনও তার ঘাটতি—রাস্তার উপর তৎক্ষণাৎ মাথা ঠুকতে ইচ্ছা করেছিল তার।

আর সেটা সামলাতে গিয়েই তার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত হল একটা উন্মাদ ক্ষোভ। উলঙ্গ রাস্তার উপর বসে, বহুক্ষণ ধরে ফুলে ফুলে উন্মাদ সেই ক্ষোভটাকেই সে উজাড় করল ভগবানের উদ্দেশ্য।

প্রায়শ্চিত্ত কি তবে সুরু হল তার ?

নিজেকে কোনরকমে সামলাল ! তারপর এক সময় কোচড় থেকে আঁচলের খুটে বেঁধে নিল সারাদিনের ভিক্ষের পয়সা। বুক বেঁধে সুরু করল আবার পথ চলা। একটা অদ্ভুত হতবুদ্ধিকর অবস্থা ! চারপাশে কি হচ্ছে—কিছুই যেন বুঝতে পারছে না সে।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় পা ছুটোও 'টন্ টন্' করে উঠল। সন্ধ্যার আলোগুলোও একে একে জ্বলে উঠতে লাগল। তবুও বিরাম নেই। অবশেষে বিশ্রাম নেবার জন্য একটা বাড়ীর দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়াতে হল তাকে।

তার দাঁড়ানোর ভঙ্গীর মধ্যে কিছু পেয়েছিল কিনা—খেয়াল করবার মত অবস্থা তার নয়। শুধু সে লক্ষ্য করল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, একজন পথচারী তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে আসছে।

লোকটি বয়স্ক। অব্যবহিত পরেই নিকট পর্যন্ত এসে হঠাৎ লোকটা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কোন কথা বলল না। শুধু তার চোখের তারায় হয়ত কিছু সন্ধান করে থাকবে লোকটা। শেষে নিশ্চিত হতে পারল যেন।

প্যাণ্টের ছু' পকেটে হাত ঢুকিয়ে জিভ দিয়ে ঠোট চাট্তে সুরু করে বলল—দস্তুরী কি রকম ?

সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ দিয়ে যে জবাবটা উৎসারিত হয়েছিল। ভগবান জানেন—সে নয়—অন্য কেউ বলিয়েছিল তাব মুখ দিয়ে।

—দশ টাকা।—

ঠিক এই সময় সেই চেনাগন্ধটাও উঠল হঠাৎ—লোকটির গা থেকে। বুঝল, জবাবটা বোধহয় ভুল দেওয়া হয়নি।

—ইস্ এটা কি একটা রাস্তার মত দস্তুরী ?

কিছু উত্তর দিল না পদ্মিনী। বেশি বাদানুবাদ করার মত অবস্থা তার নয়।

লোকটা চলে গেল কিছুদূর। থামলো কয়েক মুহূর্ত। ভাবল কিছু একটা। আবার ফিরে এলো। এবার চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে খপ্ করে বাহুটা ধরল সরাসরি। বলল—ঠিক আছে।

একটাও কথা বলল না পদ্মিনী। মুহূর্তের মধ্যে পায়ে পা মিলিয়ে চলতে সুরু করল লোকটার সঙ্গে। দু'চার পা চলার পরই ঢুকে পড়ল একটা হোটেলের মধ্যে।

হায়রে! হোটেলের মধ্যে ঢুকতেই বুঝতে পারল পদ্মিনী। এও বোধহয় তার ভাগ্যসূত্রের খেলা! নইলে তার সেই পুরানো পরিচিত হোটেলের দেয়ালেই এসে ঠেস্ দেবে কেন—দুনিয়ায় এত যায়গা থাকতে।

লোকটা যা করাচ্ছিল তাই করছিল—এমন অস্তব্ধ অসাড় হয়ে গিয়েছিল সে। একটা জড়পিণ্ড যেন।

হোটেলের নির্দিষ্ট কামরা। সে বুঝতে পারছে—তার কাছ থেকে কি আশা করছে এই বয়স্ক লোকটি। লোকটা জামা খুলল। পেছন ফিরে গা-আলনায় জামাটা রাখতে রাখতে জিজ্ঞাসা করল—কোথায় থাকা হয়। রাস্তায়ই নাকি?

দু'হাতে মুখ ঢেকে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল পদ্মিনী। সারাদিন যে কান্নাটাকে ধরে রেখেছিল—সেটা অকস্মাৎ এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে এই সময় কে জানত! কিছুতেই থামতে চায় না আর।

লোকটি হতভম্বের মত ফিরল। কাছে এলো। হাতের চেটোয় ঢাকা মুখখানাকে চিবুকে হাত দিয়ে তুলে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার পর হঠাৎ তোতলাতে সুরু করল—ইয়ে মানে—ব্যাপারখানা কী তোমার—চাঁদ!

ঘাবড়ে গিয়েছিল পদ্মিনী। তাই নিরুপায়ের মত কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে এই অজ্ঞাত কুলশীল লোকটির কাছে খুলে বলেছিল সেদিন তার মৃত মেয়ের কথা। তখন কিন্তু স্বপ্নেও ভাবেনি—কাণ্ডটা

ঐ রকম ঘটবে। কারণ এ লাইনে পাষণ্ড ছাড়া হৃদয়বান মানুষের সন্ধান যে পাওয়া যায় সে তখনও জানে না।

লোকটা কেমন কুঁচকে গেল সঙ্গে সঙ্গে। কেমন বিব্রত দেখাতে লাগল তার মুখের চোয়াড়ে চেহারাটা।

মুখের মধ্যে উদ্ভট একটা শব্দ করে উচ্চারণ করল সে—মার গুলি।

তারপর জামাটা পরে নিয়ে পকেটে হাত ঢুকিয়ে চট্‌পট্ একটা দশের নোট বার করে হাতে দিল পদ্মিনীর। জিজ্ঞাসা করল—চলবে এতে?

ভিক্ষায় সে লজ্জা পায়নি। কিন্তু সে সন্ধ্যায় সে মরমে মরে গিয়েছিল ঘাড় নাড়তে। আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে লোকটা তারপর হোটেল ছেড়ে চলে গেল। আর সে অথর্ব হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ।

সেই হৃদয়বান মানুষটির দেখা সে আর জীবনে পায়নি। কিন্তু আজও মাঝে মাঝে রাস্তা চলতে চলতে এক একজন পথচারীকে দেখে তার বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে। ভাবে—যদি সেই লোকটাই হয়।

যত বড় মূল্যই দিতে হোক—রামালুর মেয়ের সৎকার রামালুর মত হয়নি। এজন্য সেই বুকভাঙ্গা কষ্টের মধ্যেও তার বুকটা এমন ভরে উঠেছিল—যে বলে বোঝাতে পারবে না সে কাউকে।

পিটার তাকে কনফেশানে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। সে যায়নি। তাই বোধহয়—পেটের মেয়ের চিতার আগুনকে সাক্ষী করে—ভগবানই তার কাছ থেকে প্রার্থনা আদায় করে নিলেন—

—হে ভগবান আমার এই হীন জীবনের অবসান কর।

॥ আট ॥

কিন্তু হায়। হীন জীবনের অবসান করার জন্য আকুতি, আর সত্যিকারের হীন জীবনের গ্লানি থেকে মুক্তি—এই দুইয়ের মধ্যে যে অসমান জমি ফারাক। তাছাড়া গ্লানির আরও কিছু অধ্যায় হয়ত তখনও বাকী ছিল বেচারীর কপালে।

আবার পদ্মিনী ফিরে এল সেই রেলপুলের তলায়। পিটার আর কুন্তীর কাছে। আবার সেই পুরানো জীবনের গতানুগতিক পুনরাবৃত্তি।

ফিরে এল বটে। কিন্তু এবার যেন অন্য মানুষ সে।

ওর মাঝখানের অনুপস্থিত দিন ক'টির কথা পিটার কিম্বা কুন্তী—কেউ কিছু জানে না। তাই দিদির ভাবান্তর তাদেরও পীড়া দেয়। অদ্ভুত একটা বিষণ্ণতা তাকে দিবারাত্র আচ্ছন্ন রাখে।

ওরা দিদির কাছে খোলসা করে জিজ্ঞাসাবাদ করতেও ভরসা পায় না তেমন। তবে কুন্তী স্বস্তি পায় না। শেষ পর্যন্ত সে এসে জিজ্ঞাসাই করে ফেল্ল একসময়—হাঁ দিদি, দেখা হয়নি বুঝি তোমরা সা'বের সঙ্গে।

পদ্মিনী অদ্ভুত একখণ্ড হাসি হাসল। সে হাসির দিকে তাকিয়ে কুন্তী সত্যি সত্যি চু'প্‌সে যাবার উপক্রম। প্রথম জিজ্ঞাসায় নিজের অজান্তে যেটুকু রসিকতার ছোঁয়া লেগেছিল সেটুকু সংশোধন করে আবার জিজ্ঞাসা করল,—কি হয়েছে গো তোর দিদি? খুলে বল না গো আমায়। আমি বুঝি তোর পর। কিছু বলা যায় না আমাকে!

কিছু হয়নি রে কুন্তী। কিছু হয়নি আমার।

—না হয়নি! তোমার চোখ বলছে সেকথা। আর তোমার মুখ এদিকে বলছে—হয়নি! হুঁ—অ—অ!

অভিমান ঠিকরে পড়ে কুন্তীর গলায়। পদ্মিনী কথার খাদ পরিবর্তন করার চেষ্টা করে। বলে—তোর সা'ব বুঝি আর আসেনিরে—এ ক'দিন।

কুন্তী চোখ মুখ লাল করে উত্তর দেয়—বয়ে গেছে আমার। সাহেব যদি আবার আসবে—তোমার কুন্তী এবার আর হাজত রেহাই করতে পারবে না। এই বলে দিলাম।

ঘাড় বাঁকাতে বাঁকাতে কুন্তী চলে যায়। আগেকার মত দিনগুলি যেন কিছুতেই আর সহজ হতে চায় না। বিশেষ করে রামালুর বাচ্চাটার মৃত্যুর আরোও পরে—এ যেন দুটো চশমা।

আগের চশমাটা পরে যে রূপ রং দেখা যেত জিনিসের পরের চশমাটা চোখে উঠবার পর—সে রূপ সে রং ও সবের কিছুই যেন আর ধরা পড়ে না দৃষ্টিতে। একি হোল পদ্মিনীর।

সেই রেলপুলতলা। সেই ইট সাজানো খেলাঘর। সেই খড় বিছানো বিছানা। সেই ভিক্ষা-সম্বল জীবন। সেই বাইরে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজের দলের চোখে পড়বার আশংকা।

এ সবের মধ্যে যে এত মর্মান্তিক অন্তর পীড়া—কে জানতো এর আগে।

এ কয়দিন কুন্তী আর পিটারই বেরোত গানে। ওরা পদ্মিনীকে যে কেন রেহাই দেয় তা ওরাই জানে। আর পদ্মিনীও গরজ করে নিজের থেকে ওদের সঙ্গে যেতে চায়নি ফিরে আসার পর।

সেদিন পদ্মিনী নিজের থেকেই বল্ল পিটারকে।—পিটার, আজ আমরা তিনজনেই বেরুব রে। বসে বসে গতর পোষা আর কতদিন ভাল লাগে বলতো।

পিটার বল্ল—থাক না দিদি। তোমার মন আর তবিয়ৎ দুইই যখন বে-চাল করছে—থাকই না কিছুদিন ঘরে বসে। দিনকতক

না হয় আমরাই বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াই তোমাকে। পদ্মিনী বল্ল—জানিস, কতদিন দুঃখী লড়্‌কীর গান গাই না। গান গাইতে পারলে, আমার সব ঠিক হয়ে যাবে আবার।

কিন্তু পিটার নাছোড়। পিটারের ভালবাসার জোরের কাছে পদ্মিনীকে কম-জোরী হয়ে পড়তেই হল। হার স্বীকার করল শেষ পর্যন্ত।

ওরা ছুটিতে বেরিয়ে যাবার পর আবার একলা পদ্মিনী। আর একলা বলেই বোধ হয় বিমনা ভাবটা আবার পেয়ে বসল তাকে।

একটু গড়ানোর ইচ্ছে হল। শুয়ে পড়ল তার সেই খড়ের বিছানায়।

খেলপুলের ফাঁক দিয়ে একফালি আকাশ চোখে পড়ল। সেখানে তখন গোধূলির অপূর্ব বর্ণ সমারোহ। সেদিকে চেয়ে রইল মুগ্ধ দৃষ্টিতে।

হঠাৎ ভিতরটা মনে হতে লাগল মরুভূমির মত। কিসের একটা তৃষ্ণায় যেন আকণ্ঠ শুষ্ক। উঠে বসল।

উঃ কতদিন। যেন কতযুগ সে দুঃখী লড়্‌কীর গান গায় না। সে অনুভব করতে লাগল—গান গাইতে না পারার তৃষ্ণা—তার সারা সত্তার মধ্যে ভাঙ্গাচুর করতে সুরু করেছে।

গানের ভিতর দিয়ে অন্তরের যাবৎ গ্লানির সেই যে মুক্তি সে আস্বাদে বঞ্চিত হয়ে এভাবে—সে বাঁচবে না—কিছুতেই বাঁচতে পারবে না বেশিদিন।

ভাবল, হারমোনিয়ামটা গলায় ঝুলিয়ে এখন সে বেরিয়ে পড়বে একলা। কিন্তু হারমোনিয়ামটা নিয়ে পিটাররা বেরিয়েছে ভাবতেই আবার দমে গেল খানিকটা।

তবু মন মানে না। একলা একলা সেই কোণ আঁধারে বসে গুন্ গুন্ করে সুরু করল সুর ভাজতে।

কতক্ষণ তন্ময় হয়ে সুর ভেজেছে খেয়াল নেই। হঠাৎ তাকিয়ে দেখে আকর্ণ হাসি বিস্তৃত করে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সেদিনকার সেই সেপাইজী। তবে আজ সিপাহীর পোষাকের বদলে সাধারণ পোষাক পরা বলে প্রথমটা চিনতে অসুবিধাই হচ্ছিল।

চিনতেই সমস্ত অন্তরাত্মা কেমন যেন কেঁপে উঠল। থেমে গেল সুর।

বড় কষ্ট হচ্ছিল সুর থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিতে—মায়ের স্তন থেকে শিশুকে জোর করে ছাড়িয়ে নিতে যেমন কষ্ট হয়।

হাসলো দেঁতো হাসি।

বল্ল,—রাম, রাম, সা'ব।

—আরে! রাম, রাম! সব আচ্ছা তো।

ঘাড় নাড়ল পদ্মিনী।

—হামার মেম সা'ব কিধার—একগাল আকর্ণ হাসি আবার বিস্তার করলেন সিপাহীজী।

মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে উঠল পদ্মিনীর।

বল্ল—বাহার গিয়াছে—সা'ব।

গোঁফে চাড়া দিতে দিতে সা'ব বললেন—তখন চুরি করে গান শুনে লিয়েছি কিন্তু। তারপর একবার ঢোক গিলে আবার বললেন, —তুমার ভয়েস্ বহুত বহুত আচ্ছা! ভয়েস্ মালুম হয় কি একদম সিনেমার ভয়েস্।

ইতিমধ্যে সেই হাজতের আতঙ্ক ভিতরে ভিতরে চাড়া দিতে সুরু করেছে পদ্মিনীর। কে জানে আজও সেই মতলব কিনা ব্যাটার। যদিও সাদা পোষাকে এসেছে। কিন্তু পুলিশদের কি বিশ্বাস আছে নাকি!

তার উপর সে আজ একদম একলা। মনে মনে প্রমাদ গণল সে। মুখে অবশ্য যতদূর সম্ভব মোলায়েম করে হাসি আনল।

বলল,—আপনাদের মেহেরবাণী সা'ব। যখন এসেই পড়েছেন, মেহেরবাণী করে একটুখানি বসেই যান গরীবের আস্তানায়।

সা'ব জানে কোথায় বসার জায়গা। খুসী মনে আজ ইটের স্তূপটা নিজেই ঝেড়ে নিয়ে বসে প'ড়ল সিপাহীজী।

তারপর আর একবার গোঁফে চাড়া দিল। এবং আরও একবার সেই আকর্ণ হাসি বিস্তৃত করে বলল,—

—বহুতাচ্ছা। কম্‌সে কম্ তুমার একটা গানই তো শুনিয়ে দাও।

কি কষ্টে সে সেই সন্ধ্যায় সিপাহীজীর চিত্তবিনোদনের জন্য কণ্ঠকে পীড়া করে গান সুরু করতে হয়েছিল তা ভগবান জানেন।

অবশ্য একবার সুরু করতে পারলে, শেষে আর কষ্ট হয় না তেমন। শেষ পর্যন্ত সুরের অতলে পদ্মিনী যে কেমন করে হারিয়ে যায়—তা নিজেই ভাল বুঝে উঠতে পারেনি কোনদিন।

গান শেষ হল। কিন্তু সিপাহীজীর শেষ হল না। খানিকক্ষণ ঝিম ধরে বসে থাকল সে। পদ্মিনীর গানের রেশ তখনও হয়ত তার মনের মধ্যে ভাসছে।

তারপর একসময় উঠে দাঁড়ালো। সামনে এগিয়ে এল। শ্বাস বন্ধ করে আবার প্রমাদ গণতে লাগল পদ্মিনী।

ওর কাঁধে হাত রেখে বললেন সিপাহীজী,—বহুত আচ্ছা ভয়েস্ তুমার ছুকরী। বহুতাচ্ছা ভয়েস!

পদ্মিনীর মনে আশঙ্কার তখনও শেষ নাই। এযে ঠিক ব্রিজলালের মত। একই ভঙ্গী। একই ভাষা।

যতক্ষণ কাঁধের উপর সিপাহীজীর পুরুষালী সেই থাবাটা বসানো ছিল, ততক্ষণ দাঁতে দাঁত চেপে যেন কোন রকমে নিজের সত্তাকে টিকিয়ে রাখল সে।

অবশেষে সিপাহীজী হাত তুলে নিল বটে। কিন্তু মুখ আনল ওর কানের কাছে।

বলল কিসফিসিয়ে—যেন একান্ত গোপন কথা। এতক্ষণে সত্যিই ঘাবড়ে উঠল পদ্মিনী। ঘামতে লাগল দরদর করে।

—এ থানা থেকে হামিলোক দুস্‌রা থানায় বদলী হয়ে গেছি। হামার মেম সা'বকে বলবে—সেজন্য ডর কিছু নেই। নয়া যে আদমী চার্জ লিয়েছে, উলোক হামার দোস্‌। উ সব জানে। ব্যাস, ঘাবড়াও মাৎ—পদ্মিনী শুধু বল্ল জবাবে—গরীবের উপর আপনার বহুত বহুত মেহেরবাণী সা'ব। ভগবান আছেন। নইলে এত অল্পে সেদিন সে কিছুতেই রেহাই পেতে পারত না। সে হলফ করে বলতে পারে।

সা'ব চলে যাবার পর অনেকক্ষণ সে বসে রইলো হতভম্বের মত।

সেদিন কুন্তীকে দিয়ে যে পাপ করেছিল ভগবান বোধ হয় আজ তারই বদলা নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ অবধি সেই ভগবানেরই করুণা। নইলে সা'ব যদি শুধু মাত্র গানে তুষ্ট না হোত, কি করবার ছিল তার!

সে আবার বিশ্বাস করে পাপের সাজার জন্য যদি নরক থাকে—তা এখানেই।

সারাটা শরীর তার ঝিম ঝিম করতে লাগল বহুক্ষণ। রামাল্‌ আর তার বাচ্চার মৃত্যুর পর—এও এক নতুন অনুভূতি তার পক্ষে। হয়ত এরও প্রয়োজন ছিল তার জীবনে।

সে যেমন বিশ্বাস করে—পাপের সাজার জন্য যে নরক, তা এখানেই তেমনি তার বিশ্বাস, অন্তর থেকে উৎসারিত আবেদন ভগবান নাকচ করেন না। হাত ধরে তিনিই উদ্ধার করেন নরক থেকে।

নইলে তার পেটের মেয়েকে শ্মশানে রেখে আসার তিন মাসের মধ্যেই পরিমল চৌধুরীর মত মানুষের সাক্ষাৎ সে পেল কি করে!

পিটার একদিন সেই যে তাকে কনফেশানে নিয়ে যেতে চেয়েছিল সে যায়নি। হয়ত খ্রীষ্টানের দেবতার প্রতি সেদিনকার

অবহেলা তার দেবতাও ভাল চোখে দেখেন নি। তাই পুরো কনফেশান আদায় না করা পর্যন্ত তৃপ্ত হননি তিনি। ভালই হয়েছে।

কোর্টের বিবৃতি শেষ হবার পর—কেমন যেন তার মনে হতে লাগল—জীবনে এই প্রথম পরিচ্ছন্ন হাওয়ায় বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারছে সে। অন্যথায় অপূর্ব এই পবিত্র অনুভূতির শরীক সে হতে পারত কি করে!

ফাঁকা কোণটা ঘেঁষে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল খেয়াল নেই ঠিক। খেয়াল নেই রাস্তার আলোগুলোই বা কখন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে কারা! হঠাৎ পিঠে হাতের স্পর্শ অনুভব করে চমকে উঠল পদ্মিনী।

সশব্যস্ত পরিমল চৌধুরী অবাক হয়ে বললেন—তুমি এখানে, আর আমরা—। মাথা নীচু করল পদ্মিনী অপরাধীর মত।

—যাকগে—চৌধুরী গাড়ী ডাকলেন। বল্লেন,—নাও গাড়ীতে ওঠো।

গাড়ীতে উঠবার আগে হাজার বার ইতস্ততঃ করল বেচারী। না না, নিজের জীবনের ভয় তার ঘুচে গেছে অনেকদিন। তার মত তুচ্ছ একটি জাহান্নমের মেয়ের জন্য যে একটা মূল্যবান জীবন বিপন্ন হল। যে একটি জীবন অকারণ উৎসর্গীকৃত হল। কিম্বা বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন! এরকম হাজারো চিন্তা জালের মত তার মগজকে দীর্ণ করে তুলেছিল।

অথচ এসব কথা খুলে বলবারও নয় চৌধুরীকে। নাকি কোনদিন বুঝিয়ে বলা সম্ভব কাউকে! শুধু গাড়ীর মধ্যে অনেক চেষ্টা করেও একবারই মাত্র সে নৈঃশব্দ ভাঙ্গতে পারল। জিজ্ঞাসা করল অত্যন্ত দুর্বল স্বরে—আপনি এখনও এই জাহান্নমের মেয়েটাকে বিশ্বাস করেন স্যার?

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন চৌধুরী। বললেন বেশ শক্ত গলায় —কৈ না তো।

উত্তর শুনে যেটুকু সাহস সঞ্চিত হয়েছিল সম্পূর্ণ উবে গেল। চুপসে গেল পদ্মিনী।

এরপর সেই রাত্রেই যখন আবার ডাক পড়লা তার—পদ্মিনী সত্যি সত্যিই ঘাবড়ে উঠল। মনে হল, আজ রাত্রিটা অন্ততঃ যদি অপ্রিয় প্রসঙ্গ এড়িয়ে থাকতে পারত—সুস্থ বোধ করত।

শেষ পর্যন্ত কম্পিত হৃদয়ে হাজির অবশ্য হতেই হল। চৌধুরী বললেন—বস।—বসল ও তার সামনের চেয়ারে।

—একটা উত্তর দিতে পারবে আমার—চৌধুরীর স্বরে সেই শক্ত ভাবটা অব্যাহত। বুকের কাঁপুনি বেড়ে উঠল প্রশ্ন শুনে। অত্যন্ত নীচু গলায় ঢোঁক গিলে পদ্মিনী বলল কোন রকমে—বলুন।

—জাহান্নমের মেয়ের পুরো কাহিনীর চাইতে তোমার কোর্টের বিবৃতিগুলো ঢের সংক্ষিপ্ত। এটা নিশ্চয়ই তোমার চাইতে বেশি কেউ জানে না।

একটা নিষ্প্রাণ মূর্তির মত পদ্মিনী কোনরকমে ঘাড় নাড়লো।

—বেশ—চৌধুরী আবার শুরু করলেন। পদ্মিনী তখন রুদ্ধশ্বাস।

—এখন ধর, এই জাহান্নমের মেয়েটির কাহিনী নিয়ে, যদি কেউ ছবি তোলে একটা—তুমি নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করতে রাজী আছো?

একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস বুক থেকে মোচন করলো পদ্মিনী। এবং চোখ দুটিকে বিস্ফারিত করে চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে রইল নির্নিমেষ। এবার তার চোখে জল।

শেষ